ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৪ তম বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ নারায়ণ ৫৩৪ ■ জানুয়ারী ২০২১

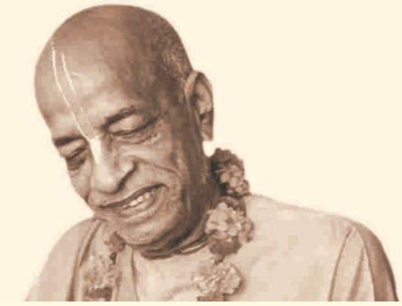

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

মাংসাহারের 'যুক্তি'

মানুষের আহার্য হচ্ছে নিরামিষ। বাঘ আপনার ফল খেতে আসে না। তার নির্ধারিত খাদ্য হচ্ছে পশুমাংস, কিন্তু মানুষের খাদ্য হচ্ছে—শাক-সবজি, ফলমুল। শস্য এবং দুগ্ধজাত খাদ্য। তাহলে আপনি কি করে বলেন যে, পশুহত্যা পাপ নয়?

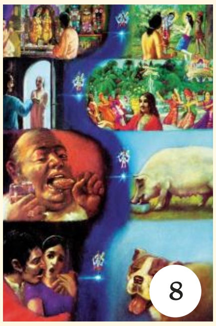

৬ আচার্য বাণী

অহঙ্কার-আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের মূল নীতি

এই পৃথিবীতে মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাব এত শক্তিশালী যে একে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। বস্তুত ভক্তিজীবনে বাধা অন্যকিছু নয় এই মিথ্যা অহমিকা। সেইজন্য যতদিন মিথ্যা অহমিকা থাকবে ভক্তিজীবনের পথে—ভক্তিযোগের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন।

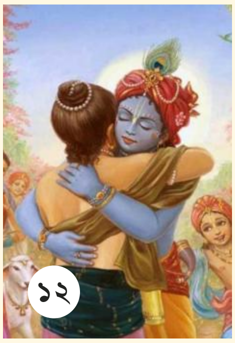

১০ সাময়িক প্রসঙ্গ

গোপকুমারের গোলোক বৃন্দাবন যাত্রা

এই জগতের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সতর্ক করেছেন যে সমগ্র জড়জগতের কোথাও কেউ নিত্য সুখভোগ করতে পারে না, সর্বত্র দুঃখ বর্তমান, কারণ মৃত্যু সর্বত্রই রয়েছে।(গীতা ৮/১৫) কিন্তু জড়জগত থেকে দূরে রয়েছে চিন্ময় জগত যা ক্ষণিক নয়, নিত্য। সেই জগতে কোন মৃত্যু নেই এবং সেই জগত যন্ত্রণামুক্ত।

১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ পরম ভোক্তা, শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর ও শ্রীকৃষ্ণ পরম মিত্র জেনে শান্ত ও নির্ভয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ অস্থির-চঞ্চল মনকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। তৃতীয়তঃ কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি প্রয়োজনে কথা বলেন।

১৮ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "মানব সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনটি শ্রীমদ্ভাগবত মেটাতে পারে, কেননা এটি হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের ভগবৎ চেতনার পূর্ণবিকাশের এক সাংস্কৃতিক অবদান।"

২৩ শাস্ত্র কথা

ব্রহ্মসংহিতা

অমানী—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যিনি ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা তুচ্ছ পদও গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করেন না। ভক্ত সব লাঞ্ছনা হাসি মুখে সহ্য করেন। তাঁর কাজের বিনিময়ে কোন রকম জাগতিক সম্মান আশা করেন না।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী

আপনার ভাগ্য কি আপনার হাতে ?

ভাগ্য হলো একটি যাত্রার পূর্বে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমাদের বলে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাত্রাকালে রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে, না তুষারাচ্ছন্ন থাকবে। কিন্তু তা কখনোই যাত্রাকালীন আমাদের কার্যাবলীকে নির্ধারণ করে না।

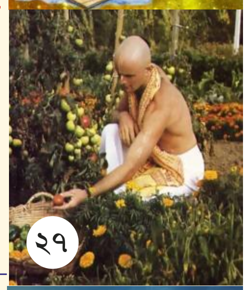

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

অকাল কুষ্মাণ্ড কাকে বলে?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

পাঁচমিশালী ঘন্ট

২০ ইসকন সমাচার

ইসকন মায়াপুরে গোবর্ধন পূজা সাড়ম্বরে পালিত হলো

২৯ ছোটদের আসর

জীবন্ত নরক!!

৩১ ভক্তি কবিতা

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

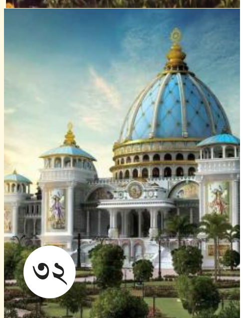

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

আমাদের প্রতিটি দিনই এক নববর্ষ

কিভাবে এটি সত্যি হতে পারে? একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন, কিন্তু এ আমার কথা নয়। ১৯৭৪ সালের ৩রা জানুয়ারী লস এঞ্জেলসে প্রাতঃভ্রমণকালে শ্রীল প্রভুপাদ একথা বলেছিলেন। "হ্যাঁ, আমাদের প্রতিটি দিনই এক নববর্ষ। নব-নবযৌবন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত এত সুন্দর, আপনি যতই অগ্রসর হবেন, দেখবেন নববর্ষ, নববর্ষ। এই সব কিছুই পুরাতন নয়। লোক দেখে যে তারা শুধুমাত্র সেই পুরাতন শ্লোগান, হরেকৃষ্ণ জপ কীর্তন করছে। কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তে নবীন আনন্দ উপলব্ধি করছি।" (শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃভ্রমণ, লস এঞ্জেলস, ৩ জানুয়ারী, ১৯৭৪)

এই হলো পারমার্থিক জীবনের সৌন্দর্য। প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্ত নবীন আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই আনন্দ সীমাহীন। জড়জগতের তথাকথিত আনন্দ অনিত্য এবং তা তৃপ্তিদায়ক নয়। বস্তুত এই জগতে আনন্দরূপে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তা প্রকৃতপক্ষে বেদনার অনুপস্থিতি।

কিন্তু কৃষ্ণভক্তি অভ্যাসে ভক্ত যে আনন্দ লাভ করে তা এত চিত্তাকর্ষক সে পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে এই আনন্দের অভিলাষী হয়।

চাতক পাখী যেমন তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মরিয়া হয়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির অপেক্ষা করে, একজন কৃষ্ণভক্তও শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের মাধ্যমে তার হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করতে চায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপে এত আনন্দ অনুভব করতেন যে তিনি পুনঃ পুনঃ জপ করতে চাইতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাতরভাবে ভিক্ষা চাইতেন, "হে কৃষ্ণ! আমাকে লক্ষাধিক জিহ্বা এবং লক্ষাধিক কর্ণ প্রদান করুন, যাতে আপনার দিব্যনাম জপে যে অসীম আনন্দ আমি লাভ করি তা আমি উপভোগ করতে পারি।"

আমাদের জন্যও এই আনন্দ অপেক্ষা করে আছে। আমরাও আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উৎসবমুখর করে তুলতে পারি। শুধু আমাদের শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত হতে হবে।

এই পৃথিবীতে আনন্দ লাভের যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন আমরা কখনই তা পাব না। আমাদের সকল প্রচেষ্টাই অবশেষে পরাজিত হবে। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিটি নববর্ষই আমাদের মৃত্যুর আরও সন্নিকটে নিয়ে আসে। আমরা কেউই মরতে চাই না।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত প্রতি মুহূর্ত কৃষ্ণের সন্নিকটে আসেন। এই পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্ত এবং আনন্দময় থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৮.১৫—১৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি এই জীবনান্তে অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রত্যাগমন করবেন। শ্রীকৃষ্ণের ধামে জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু নেই।

নববর্ষে মানুষ সংকল্প গ্রহণ করে। সেইজন্য এই ২০২১ সালে শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভক্ত হয়ে উঠব। আমরা ঐকান্তিকভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করব। যে কোন পরিস্থিতিতেই আমরা জপ ত্যাগ করব না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি শ্রীকৃষ্ণ হতে অভিন্ন তিনি আমাদের এই মহামন্ত্রের অপরিসীম মহিমা এবং শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে জপ আমাদের হৃদয় থেকে সকল অপবিত্রতা দূর করে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে সহায়তা করে। এই স্থিতি একবার লাভ করলে আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই উৎসবমুখর হবে। আমাদের প্রতিটি দিনই হবে নববর্ষ।

নিম্নলিখিত কথোপকথনটি প্রায় দশ বছর পূর্বে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং কার্ডিনাল ড্যানিয়েলের মধ্যে প্যারিসে সংগঠিত হয়েছিল।

মাংসাহারের "যুক্তি"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভূপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যিশু খ্রিষ্ট বলেছিলেন, "তুমি কাউকে হত্যা করবে না।" তাহলে খ্রিষ্টানেরা পশুহত্যা এবং মাংসাহারে লিপ্ত কেন?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ খ্রিষ্টান ধর্মে অবশ্যই হত্যা নিষিদ্ধ তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, মনুষ্য-জীবন পশু-জীবনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের জীবন পবিত্র, কারণ ভগবানের প্রতিকৃতি অনুসারে মানুষকে তৈরী করা হয়েছে। তাই বাইবেল অনুসারে কোন মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু বাইবেলে তো বলা হয় নি, "মানুষকে খুন করবে না।" সেখানে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, "তুমি হত্যা করবে না।"

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আহার সংগ্রহের জন্য মানুষকে পশুহত্যা করতে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, মানুষ শাক-সবজি, ফল মূল এবং দুধ খেতে পারে।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ মাংস একদম নয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, মানুষের আহার্য হচ্ছে নিরামিষ। বাঘ আপনার ফল খেতে আসে না। তার নির্ধারিত খাদ্য হচ্ছে পশুমাংস, কিন্তু মানুষের খাদ্য হচ্ছে—শাক-সবজি, ফলমূল। শস্য এবং দুগ্ধজাত খাদ্য। তাহলে আপনি কি করে বলেন যে,

পশুহত্যা পাপ নয়?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর। যদি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দেওয়ার জন্য পশুহত্যা করা হয় তা হলে তা ন্যায় সঙ্গত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু আপনি একটি গাভীর কথা বিবেচনা করে দেখুন, আমরা তার দুধ খাই, তাই গাভী হচ্ছে আমাদের মাতা, সেটি আপনি স্বীকার করেন?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং গাভী যদি আপনার মাতা হয়, তা হলে আপনি কিভাবে তাকে হত্যা করা বরদাস্ত করতে পারেন? আপনি তার দুধ খান, আর তার পর সে যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং আর দুধ দেয় না, তখন তার গলা কাটেন। এটি কি মানবোচিত আচরণ? ভারতবর্ষে যারা মাংসাহারী তাদের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাঁঠা, শূকর, ভেড়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের পশুদের হত্যা করে তাদের মাংস আহার করতে। কিন্তু গো হত্যা হচ্ছে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার সময় আমরা মানুষকে অনুরোধ করি কোন রকমের মাংস আহার না করতে এবং আমার শিষ্যেরা কঠোরভাবে সেই নিয়মটি পালন করে। কিন্তু কোন বিশেষ অবস্থায় অন্যদের যদি মাংস একান্ত খেতেই হয়, তা হলে তারা নিম্ন স্তরের পশু মাংস আহার করতে পারে। কিন্তু গো হত্যা করবেন না। সেটি হচ্ছে সব চাইতে বড় পাপ। আর মানুষ যতক্ষণ পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভগবানকে জানতে পারে না। মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা এবং তাঁকে ভালবাসা। কিন্তু আপনি যদি পাপ কর্মে লিপ্ত থাকেন, তাহলে আপনি কখনো ভগবানকে জানতে পারবেন না—আর তাঁকে ভালবাসার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যখন অন্য কোন খাবার থাকে না তখন জীবন ধারনের জন্য মাংস খাওয়া যেতে পারে, সেটি অন্য কথা। কিন্তু রসনা তৃপ্তির জন্য কসাইখানায় পশুহত্যা করাটা সবচাইতে গর্হিত

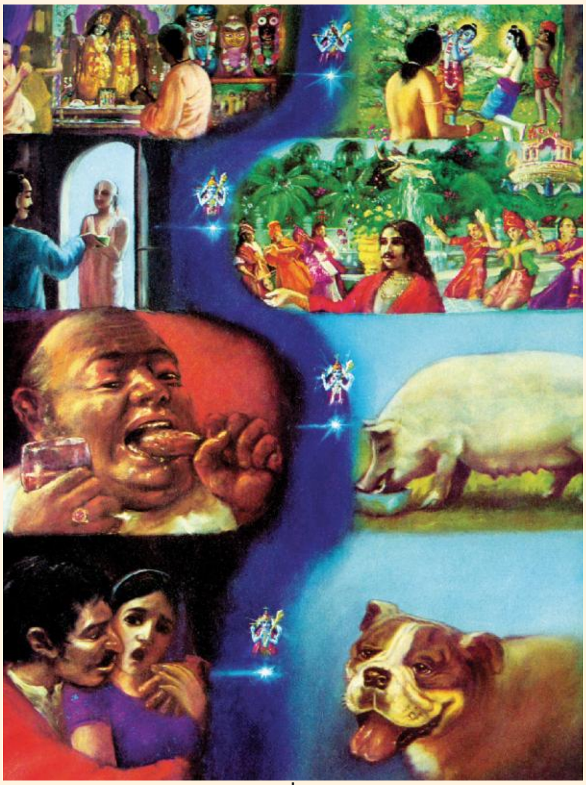

প্রকৃতপক্ষে, যতদিন পর্যন্ত না এই সমস্ত হিংসাত্মক কসাইখানাগুলিকে বন্ধ করা হচ্ছে, ততদিন আপনারা যথার্থ মানব-সমাজ গড়ে তুলতে পারবেন না। আর যদি জীবন ধারনের জন্য মাংসের প্রয়োজন হয়ও, তবুও কখনোই মাতৃবৎ যে পশু, সেই গাভীকে হত্যা করা উচিত নয়। সেটি হচ্ছে মানবিক শালীনতা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই বিষয়টির ওপর আমরা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা কখনোই পশুহত্যাকে অনুমোদন করি না।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" শাক-সবজি, ফল-মূল ভক্তি সহকারে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) উদ্দেশ্যে অর্পন করা উচিত।" (ভগবদ্‌গীতা ৯/২৬) আমরা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগ (খাদ্যদ্রব্য) নিবেদন করে প্রসাদ রূপে তা গ্রহণ করে থাকি।

মানুষের আহার্য হচ্ছে নিরামিষ। বাঘ আপনার ফল খেতে আসে না। তার নির্ধারিত খাদ্য হচ্ছে পশুমাংস, কিন্তু মানুষের খাদ্য হচ্ছে—শাক-সবজি, ফলমূল, শস্য এবং দুগ্ধজাত খাদ্য। তাহলে আপনি কি করে বলেন যে, পশুহত্যা পাপ নয়?

আমরা গাছ থেকে অনেক ফল পেয়ে থাকি। কিন্তু সেই ফলগুলি নেওয়ার ফলে গাছটির মৃত্যু হয় না। অবশ্য যদিও একটি প্রাণীর খাদ্য হচ্ছে অন্য আর একটি প্রাণী, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, খাদ্যের জন্য নিজের মাকে হত্যা করতে হবে। গাভীরা নিরীহ, তারা আমাদের দুধ দেয়। নিজের জীবন ধারনের জন্য তাদের দুধ গ্রহণ করে তারপর তাদের কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা কখনোই উচিত নয়। সেটি পাপ।

জনৈক শিষ্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, খ্রিষ্টানরা মনে করে যে নিম্ন যোনী সম্ভূত জীবদের মানুষের মতো কোন আত্মা নেই এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে তারা মাংসাহার অনুমোদন করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটি তাদের মূর্খতা। সর্বপ্রথমে আমাদের

দেহে আত্মার উপস্থিতির লক্ষণগুলি সম্বন্ধে জানতে হবে। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে, নিম্নতর যোনী সম্ভূত জীবদের আত্মা আছে কি নেই। মানুষ এবং পশুর মধ্যে গুণগত কি পার্থক্য আছে? যদি আমরা তাদের মধ্যে সে রকম কোন পার্থক্য দেখতে পাই, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, পশুর মধ্যে কোন আত্মা নেই। কিন্তু মানুষ এবং পশুর মধ্যে যদি আমরা গুণগত কোন পার্থক্য না দেখতে পাই, তাহলে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, পশুর কোন আত্মা নেই? সাধারণ লক্ষণগুলি হচ্ছে, পশুরা আহার করে, মানুষেরাও আহার করে, পশুরা নিদ্রা যায়, মানুষেও নিদ্রা যায়, পশুরা মৈথুনে লিপ্ত হয়, মানুষেরাও মৈথুনে লিপ্ত হয়, পশুরা আত্মরক্ষা করে, মানুষেরাও আত্মরক্ষা করে। তাহলে সেখানে পার্থক্য কোথায়?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আমরা স্বীকার করি যে মানুষের সঙ্গে পশুর গুণগত সেই রকম কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তবুও পশুর আত্মা নেই। আত্মা বলতে কেবল মানুষের আত্মাকেই বোঝায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমাদের ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, সর্বযোনিষু, "সমস্ত জীবের মধ্যেই আত্মা অবস্থান করে।"

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ তবে দর্শনগত বিচারে, মনুষ্য-জীবন অনেক বেশী উন্নত। মানুষের চিন্তাধারা পশুর থেকে উন্নত স্তরে স্থিত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেই উন্নত স্তরটা কি? পশু তার শরীর নির্বাহ করার জন্য আহার করে এবং আপনিও আপনার শরীর নির্বাহের জন্য আহার করেন। গাভী ঘাস খায়, আর মানুষ আধুনিক যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ বিরাট কসাইখানাগুলিতে জবাই করা পশু মাংস আহার করে। কিন্তু যেহেতু আপনাদের বড় বড় আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা আপনারা বীভৎস দৃশ্যের অবতারনা করছেন এবং পশুরা যেহেতু নিরীহভাবে ঘাস আহার করছে। তার অর্থ এই নয় যে, আপনারা অত্যন্ত উন্নত এবং কেবলমাত্র আপনাদের দেহেই আত্মা রয়েছে এবং পশুদের দেহে কোন আত্মা নেই। সেটি যুক্তি সঙ্গত নয়। আমরা দেখতে পাই যে, পশু এবং মানুষের মধ্যে প্রামাণিক বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

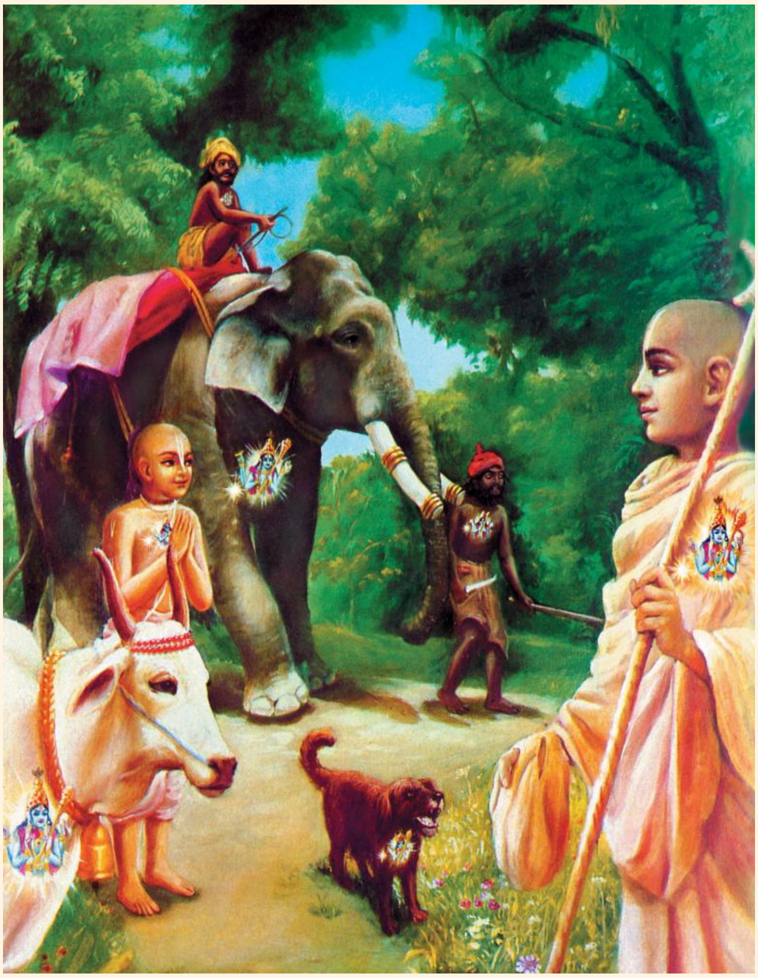

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ কিন্তু কেবলমাত্র মনুষ্য-জীবনেই দর্শনগত বিচারের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত অর্থ জানবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সুতরাং সেই দর্শনগত বিচারের মাধ্যমেই বোঝবার চেষ্টা করুন। কেন আপনি বিশ্বাস করেন যে, পশুর মধ্যে কোন আত্মা নেই—সেটিই হচ্ছে অধিবিদ্যা বা জ্ঞান সংক্রান্ত দার্শনিক বিচার। কিন্তু আপনার চিন্তাধারা যদি পশুর মতো হয়, তাহলে সেই রকম দার্শনিক বিচারের কি মূল্য আছে? অধিবিদ্যা মানে হচ্ছে 'প্রাকৃত অবস্থার উর্ধ্বে' বা এক কথায় 'অপ্রাকৃত'। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সবযোনিষু কৌন্তেয় —"প্রতিটি জীবের মধ্যেই চিন্ময় আত্মা রয়েছে।" সেটিই হচ্ছে অধিবিদ্যামূলক জ্ঞান।

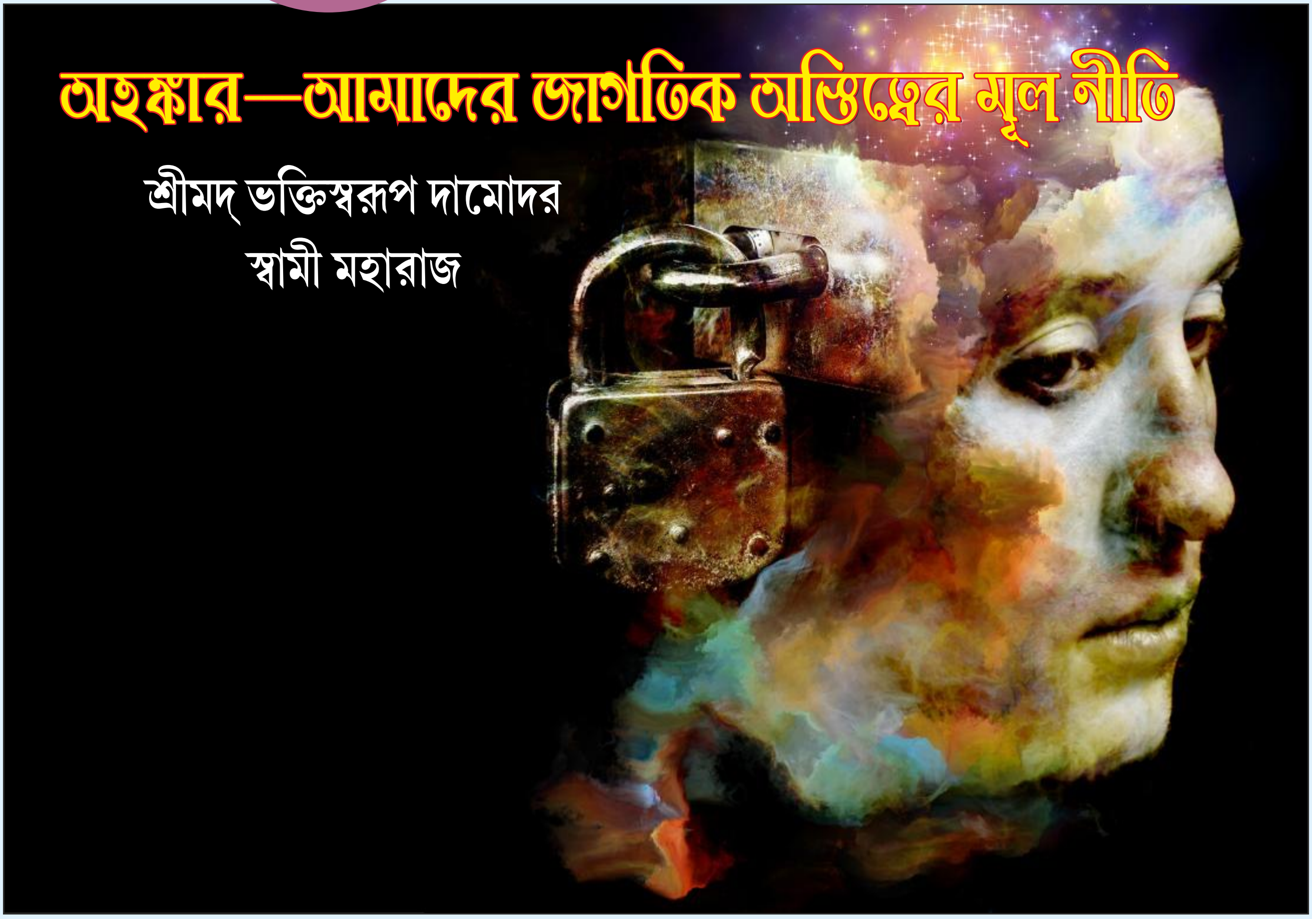

অহঙ্কার—আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের মূল নীতি

শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজ

এটি শ্রীমদ্ভাগবতমের একটি গভীর উপদেশমূলক অধ্যায়---দক্ষরাজের কার্যাবলীর আলোচনা।

যজ্ঞকালীন সমগ্র ঘটনা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত উপদেশমূলক। যে নীতি সম্বন্ধে এখানে মূল শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে সেটি হলো অহঙ্কার—বাস্তব প্রকৃতি সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, একে মিথ্যা অহমিকা বলা হয়। এই বিকশিত জগতে অহঙ্কার বিশেষভাবে প্রকট। অহঙ্কার ব্যতীত সৃষ্টি হতো না। জড় প্রকৃতিতে এটিই মূল নীতি। মিথ্যা অহঙ্কারের বশে একজন ব্যক্তির মধ্যে স্বভাবতই কিছু গর্বের উন্মেষ ঘটে। অন্যকথায়, এক ব্যক্তি অন্যকে দোষারোপ করতে উৎসাহিত এবং নিজের প্রতি নজর দিতে বিশেষ উৎসাহিত নয়। অহঙ্কার অথবা মিথ্যা অহমিকার বশবর্তী ব্যক্তির এইগুলিই লক্ষণ। দক্ষরাজার কার্যাবলীতে এগুলি দেখা যায়।

প্রজাপতিদের প্রধানরূপে দক্ষরাজকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন। বিশ্বে শান্তি এবং আনন্দ আনয়নের জন্য দক্ষরাজা এই যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞের মূল লক্ষ্য ছিল ভগবান বিষ্ণুর সন্তোষবিধান যাতে বিশ্বে শান্তি ও ঐক্য বজায় থাকে এবং প্রত্যেকে সুখে থাকে। যজ্ঞের এই উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং দক্ষের উদ্দেশ্য ভালো ছিল। প্রজাপতিদের মুখ্যরূপে কর্তব্য সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে সবার ভালো করা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকালীন তিনি কিছু অহঙ্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যজ্ঞসভায় তিনি যখন এলেন সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব একটু উদাসীন ছিলেন। শিব হলেন দক্ষের জামাতা। দক্ষ ভেবেছিলেন যদিও শিব একজন উন্নত বৈষ্ণব এবং দেবতা, জামাতারূপে তাঁকে তার সম্মান করা উচিত ছিল। দক্ষ অপমানিত বোধ করলেন—কেন তিনি এরূপ ব্যবহার করলেন? সেইজন্য তিনি শিবের প্রতি অত্যন্ত অপমানসূচক বাক্য বলেন। সেই হলো ধ্বংসের সূচনা।

অন্য কথায়, এই পৃথিবীতে মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাব এত শক্তিশালী যে একে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।

বস্তুত ভক্তিজীবনে বাধা অন্য কিছু নয়, এই মিথ্যা অহমিকা। সেইজন্য যতদিন মিথ্যা অহমিকা থাকবে ভক্তিজীবনের পথে—ভক্তিযোগের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। এই ধারণা থেকে সহজবোধ্য যে, অন্যকে দোষারোপ করা এবং নিজেকে সঠিক ভেবে অন্যকে ভুল প্রতিপন্ন করা সবার পক্ষে সহজ। এই প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকের মনে এই অনুভূতি, মানসিকতা অথবা ব্যবহার যতদিন থাকবে আমাদের ভক্তিজীবনে অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর হবে। অন্যথায়, ভক্তিযোগের প্রক্রিয়ায় মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো অহঙ্কার অথবা মিথ্যা অহমিকার প্রভাব থেকে মুক্তি। সাধনা ভক্তির প্রক্রিয়ায় এটি করা যায়। সাধনা ভক্তি অর্থাৎ রীতিনীতি সহযোগে ভক্তিজীবন যেমন নীতিগুলি অনুসরণ করা—ভক্তির নীতিসমূহ শিক্ষার অনুশীলনের পথ। সাধনা ভক্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি হলো মিথ্যা অহমিকার মোচন। যতক্ষণ না পর্যন্ত মিথ্যা অহমিকার আবরণ উন্মোচিত হবে, ভক্তিজীবনে অগ্রসর হতে অনেক সময় লাগবে।

শিক্ষাষ্টকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মার্জনা প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন—চেতোদর্পণমার্জনং অর্থাৎ মিথ্যা অহমিকার উন্মোচন। এর অর্থ আমাদের দূষিত হৃদয়কে মার্জনা করতে হবে অনেক অনভিষ্ট কার্যাবলী এবং ভাবনার দ্বারা আমাদের হৃদয় দূষিত হয়েছে। আমাদের হৃদয়ের সঞ্চিত সকল দূষণ মার্জনা করতে সময় লাগে....আমাদের সর্বদা জপ করতে হবে যাতে আমাদের সর্বদা এই প্রক্রিয়ার কথা মনে থাকে। যখন আপনি ভক্তিজীবনে সমস্যা দেখবেন, তার কারণ সেখানে দূষণ তখনও রয়েছে। এই সকল দূষণ মার্জনা করতে আমাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা করতে হবে। যখন এই দূষণগুলি সম্পূর্ণরূপে মার্জন হবে, তখন স্বভাবত রুচি অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত লক্ষণগুলি—জীবাত্মার আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে। সেই প্রকাশের স্তর অথবা চেতনার স্তরকে ব্রহ্ম-ভূত বলা হয়।

অন্য কথায় কেউ উপলব্ধি করতে শুরু করে যে সে অস্থায়ীভাবে এই দেহে আবদ্ধ আছে কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে এক নিত্য চিন্ময় সত্তা অথবা আত্মা নামক চিন্ময় অস্তিত্ব যা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। এই উপলব্ধি শুধুমাত্র বৌদ্ধিক উপলব্ধি না হয়ে আমাদের শব্দ, কার্যাবলী, ব্যবহার, আচরণ, আমাদের চারপাশের বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, আমাদের সম্পূর্ণভাবে অনুধাবনও করতে হবে। তাত্ত্বিক জ্ঞান এক বস্তু কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান আমি মনে করি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বগতভাবে আমরা প্রতিদিন বলি—অহম্ ব্রহ্মাস্মি, যে আমি এই দেহ নই আমি নিত্য চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ আত্মা—কিন্তু প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে এটি অভ্যাস করা অত সহজ নয়। সেইজন্য

> এই পৃথিবীতে মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাব এত শক্তিশালী যে একে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। বস্তুত ভক্তিজীবনে বাধা অন্যকিছু নয়, এই মিথ্যা অহমিকা। সেইজন্য যতদিন মিথ্যা অহমিকা থাকবে ভক্তিজীবনের পথে—ভক্তিযোগের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে শাস্ত্রশিক্ষার অত্যন্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো কৃষ্ণভাবনামৃত। অন্যভাবে, বিজ্ঞানের ভাষায় একে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ বলা যায়।

অন্যত্র আমরা দেখি, দেবাদিদেব শিব মহান বৈষ্ণব হওয়ায় বিচলিত হন নি। কিন্তু মহাদেবের অনুগামীগণ অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন যখন দক্ষরাজ তাদের প্রভুর প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছেন এবং তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অন্যদের অভিশাপ দিয়েছেন। সেইজন্য সেখানে অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। উভয়পক্ষই ক্রুদ্ধ ছিল। ক্রোধের কারণ ছিল মিথ্যা অহমিকা। যখন আমরা ক্রুদ্ধ হই আমরা জানি কি ঘটেছে; যখন বিশাল ক্রোধের বহ্নি জ্বলে, সকল ভালো বস্তুই ধ্বংস হয়।

আশুতোষ শিবের অনেকগুলি নামের মধ্যে একটি। আশুতোষ অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত সহজেই সন্তুষ্ট হন, তিনি বর্তমানে ক্রুদ্ধ হলেও পরবর্তী মুহূর্তে ক্রোধমুক্ত হবেন, অন্যভাবে বলা যায়, তিনি সহজে তুষ্ট হন। এটিও দেবাদিদেব শিবের গুণ। সুতরাং মহাদেব পুনরায় ব্রহ্মার অনুরোধে শান্ত হলেন । তিনি স্বভাবতই আচরণ এবং ব্যবহারে অত্যন্ত মহান। পরে দক্ষরাজ ও তার ভুল বুঝতে পারেন যে কেন তিনি শিবের প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন। এইরূপে, দক্ষরাজের পক্ষেও উপলব্ধি হয়েছিল যে, তার ব্যবহার যথার্থ ছিল না এবং তার এমন করা উচিত হয়নি। অতএব তিনি উপলব্ধি করেছেন। এটি একটি ভালো দিক। সেইজন্য এই ঘটনা থেকে ভগবানের একজন ভক্ত অথবা একজন বৈষ্ণব এই শিক্ষা পান যে

যখন কারও ভুল নির্দেশ করা হয়, তখন তাকে কৃতজ্ঞ হতে হয়। সেইজন্য দক্ষরাজ শিবের স্তুতি করতে শুরু করেন, ''হে আমার প্রিয় দেব, আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমি আশীর্বাদ লাভ করেছি এবং শিক্ষাও গ্রহণ করেছি।'' তিনি বলেননি যে, ''আপনার ক্রোধের কারণে সকল দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেছে এটি আমার কাছে শাস্তিস্বরূপ।''

এই উদাহরণ থেকে একজন বৈষ্ণব শিক্ষাগ্রহণ করেন যে, যখন কেউ ভুল করে এবং ফলস্বরূপ ভুলের ফল গ্রহণ করে তখন তিনি তাকে শাস্তিরূপে না দেখে প্রশংসা করেন। যেমন দর্শনে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যে, লোকে বলে, কেন ভালো লোকেদের সঙ্গে খারাপ হয়? অনুরূপভাবে একটি বিতর্ক আছে যে আমরা দেখি, যদি ভগবান করুণাময়, তাহলে এত পাপ কেন? পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতদের কাছে বিশেষভাবে এই বিতর্ক। কিন্তু আমরা বলি যে যখন কেউ ভক্তিমার্গ শিক্ষা করে—ভক্তির রীতিনীতি অর্থাৎ ভক্তির প্রক্রিয়া এবং ভক্তির এই জ্ঞান — তখন এই প্রশ্নগুলি আসবে না। যখন কেউ নববিধা ভক্তি সম্বন্ধে পরিচিত হয় এবং যখন কেউ ভক্তিজীবন সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় তখন এই প্রশ্নগুলি আসবে না। কেন? কারণ এইরূপ এক ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করে যে 'জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত আমার নিজকর্মের ফলস্বরূপ আমি এই ফল লাভ করছি।' যেমন বাইবেলে একটি কথা আছে ''তুমি যেমন বীজ বপন করবে, তেমনি তুমি ফসল পাবে।'' এটি একটি বৈজ্ঞানিক নীতি, এমন কি নিউটনের সূত্রে তৃতীয় গতিসূত্র বলে যে '' প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।''... সেইজন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ ভক্তিপথের শিক্ষা গ্রহণ করবে, তার এই উপলব্ধি বা বোধ হওয়া ততক্ষণ সহজ হবে না।

সেইজন্য সিদ্ধান্ত হলো — দেবাদিদেব শিব ও দক্ষরাজ উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভক্তিযোগ অভ্যাসের কারণে সঠিক বোধে উপনীত হয়েছিলেন। এইরূপে যখন মিথ্যা অহমিকা, ভক্তি দ্বারা উন্মোচিত, নিয়ন্ত্রিত অথবা মার্জিত হয় তখন সবকিছু স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে।

এই হলো কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রক্রিয়া—তিন স্তরে একজনকে শিক্ষণ প্রদান—দেহ, মন এবং আত্মা। দেহকে সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং মনকেও সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে। যখন দেহ এবং মন মার্জিত হবে তখন সাধারণ ভাবেই আত্মা পরিমার্জিত হবে। অতঃপর আমরা অগ্রসর এবং বিকশিত হব ... সেইজন্য শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই অধ্যায়ে—দক্ষরাজের যজ্ঞ এবং দক্ষযজ্ঞের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অধ্যায়গুলি আমাদের সকলের জন্য শিক্ষামূলক ...

আমাদের প্রকাশ এবং বাক্যের সীমাবদ্ধতার জন্য পরমেশ্বর ভগবান অথবা পরম সত্যের প্রকৃতিকে যথার্থরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এমন কি উপলব্ধির ক্ষেত্রেও পরম সত্যকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যাইহোক পরম সত্যের আশীর্বাদে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে আমরা এর এক ঝলক পেতে পারি।...কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে আমার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা বা আন্তরিক প্রচেষ্টা দ্বারা আমি এই চিন্ময় প্রকৃতির দর্শন অথবা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব তাহলে আমি ভুল ভাবছি। অন্যভাবে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি স্বীকার না করব যে ''আমার বোধ সীমাবদ্ধ এবং ভগবানের অসীম প্রকাশকে আত্মস্থ করার ক্ষমতা আমার অত্যন্ত সীমিত, এই অত্যাশ্চর্য সত্যসিন্ধুকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা অসম্ভব'' সেই স্তরে না পৌছানো পর্যন্ত এ অসম্ভব। আমি যদি সরলভাবে ভাবি যে আমার বুদ্ধিমত্তা, আমার ভাবনা দ্বারা পরম সত্যক জানা সম্ভব, তাহলে আমি সম্পূর্ণ ভুল করব। কিন্তু যখন আমি উপলব্ধি করব যে আমার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করতে হবে এবং আমি ভগবানের কৃপার শরণাগত হব, তখন পরম সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার কিছু বোধ হতে পারে। ভগবান সেই ব্যক্তিকে বুদ্ধিমত্তা ও বোধ প্রদান করবেন এবং ভগবানের অপার কৃপায় পরম প্রকৃতি সম্বন্ধে তার কিছু উপলব্ধি প্রাপ্তি হতে পারে।

এটিও ভক্তির প্রক্রিয়া। কিন্তু যদি আমাদের আংশিক উপলব্ধি থাকে সেটিও আমাদের কর্তব্যানুসারে ভগবানের সেবা করার পক্ষে পর্যাপ্ত।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। অকাল কুষ্মাণ্ড কাকে বলে ?

—সমীর বসাক, বীরভূম

উত্তর ঃ অকাল (ঠিক সময় মতো নয়) কুষ্মাণ্ড (কুমড়ো)। বিশেষ করে ছাঁচি কুমড়ো বা চাল কুমড়ো যখন অকালে উৎপন্ন হয়, তাকে বলে অকাল কুষ্মাণ্ড। সাধারণত শরৎ ও হেমন্তকালে কুমড়ো গাছ সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে। অনেক কুমড়ো উৎপন্ন হয়। কুমড়োগুলো পুষ্ট হয়। সেই কুমড়োগুলো যদি গাছেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পেকে যায়, তবে বহুদিন পর্যন্ত সেগুলি রাখা যায়। কিন্তু, সেই কুমড়োগুলো যদি অকালে বা অন্য কোনও ঋতুতে উৎপন্ন হয়, তবে সেগুলি পুষ্ট হয় না। সুস্বাদু হয় না। অকালে পাকে অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায় বিবর্ণ হয়। সেগুলো অখাদ্য বস্তু রূপে ফেলে দেওয়া হয়।

কিন্তু, আমাদের সমাজে কুমড়োকে নয়, মানুষকে কখনও কখনও তিরস্কার করে 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বলা হয়। যেমন—

১) অলস বা আনমনা ঃ যে সমস্ত মানুষ ঠিক সময় মতো কাজকর্ম গুছিয়ে রাখতে বা সম্পাদন করতে পারে না। তারা অকাল কুষ্মাণ্ড। যেমন—ছাত্র যদি সময় মতো পড়াশোনা না করে আল্‌সে আনমনা হয়ে থাকে, মা-বাবা যদি সন্তানকে সময় মতো আদর যত্ন ও শাসন না করে, রাধুনী যদি সময় মতো রান্না না করে, জোয়ানেরা যদি পরিবারের বৃদ্ধ অথর্বদের সেবা করতে অনীহ হয়, কৃষক যদি সময় মতো বীজ সংগ্রহ, ভূমিকর্ষণ, বীজ বুনন, চারা রোপণ, গাছ রক্ষা এবং ফসল গচ্ছিত করণাদি কার্য না করে, তাহলে এই ধরনের লোক পারিবারিক বা সামাজিক দিকে থেকে হেয় রূপে প্রতিপন্ন হয়।

২) দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ঃ যে মানুষ তার দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েও দায়িত্ব পালন করে না। সে অকাল কুষ্মাণ্ড। বিবাহিত হয়েও দাম্পত্য জীবনে একে অন্যের কোনও দায়িত্ব নিতে উদাসীন। পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও মদ, মাংস, অবৈধ সঙ্গ, জুয়া প্রভৃতিতে যুক্ত হয়ে পরিবারের আত্মীয়বর্গের প্রতি কর্তব্যবোধ শূন্য হয়ে থাকে। সমাজে যথেষ্ট সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্য অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তা করতে জানে না। এরা অকাল কুষ্মাণ্ড রূপে হেয়।

৩) সাধনহীন ধূর্ত ঃ যে মানুষ হরিভজন করে না, অথচ বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব আউড়িয়ে নিজেকে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্ব রূপে জাহির করে। কোনও কোনও কুমড়ো বড় সাইজের, পাকা দেখতে, কিন্তু ভেতরটা পোকায় ভর্তি। তেমনই কোনও কোনও মানুষ কত অভিজ্ঞ ব্যক্তি রূপে দেখতে, কিন্তু ভেতরটা কাম-ক্রোধ ও প্রতিষ্ঠাশায় ভর্তি।

এই তিন ধরনের মানুষকে অকাল কুষ্মাণ্ড বলা হয়।

প্রশ্ন ২। কোনও একটি অঞ্চল বা গ্রাম বেশ সুন্দর। কি বৈশিষ্ট্য দেখে তা বিচার্য ?

উত্তর ঃ অঞ্চলের বা গ্রামের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেখেই বলা হয়, ওই অঞ্চল ভালো, না খারাপ। যথা—

১) নেতা ঃ অঞ্চলের প্রত্যেকে যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দে ক্রিয়াশীল হয়ে শুদ্ধভাবে জীবন যাপন করে সেই বিষয়ে নেতা সবার তথ্য সংগ্রহ করে তার ব্যবস্থা করে থাকেন। মা-বাবা যেমন সন্তানদের দেখাশোনা করেন, শাসন করেন, পালন করেন, নেতাদের কাজও তেমনই।

২) ধনী ঃ বেকার, মূর্খ, ভিখারী, হীনকর্মা এই ধরনের কাউকে ওই অঞ্চলে দেখা যাবে না। ছোট হোক বড়ো হোক সুন্দর থাকার ঘর থাকবে। যে যার কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবে। ঘরে খাদ্য সঞ্চিত থাকবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য টাকা পয়সা থাকবে। তেল, নুন, শাক-সবজী, মশলাপাতি, স্বচ্ছ সুন্দর কাপড় চোপড় থাকবে।

৩) শ্রোত্রিয় ঃ প্রত্যেকেই ভগবদ্‌ভক্ত থাকবে। হরিভজনের প্রতিকূলতা পরিত্যাগ করবে। গোপাল দাস বাহাদুরের রাজত্বে যেমন। সবাই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবে। বিগ্রহ অর্চনা করবে। আরতি ভোগ নিবেদনাদি প্রসাদ সেবন করবে। হরিকথা আলোচনা করবে। প্রীতিভাবাপন্ন থাকবে। গীতা ভাগবত পড়বে।

৪) বৈদ্য ঃ শারীরিক নানা দুর্বিপাক, অসুস্থতা সমাধানের জন্য অবশ্যই চিকিৎসক থাকবে। ঘর-দুয়ার পথ-ঘাট পরিচ্ছন্ন থাকবে। স্নিগ্ধপূর্ণ গাছপালা থাকবে। যেখানে সেখানে কফ, থুথু, মল, মূত্র প্রভৃতি ফেলে নোংরা করবে না।

৫) জল ব্যবস্থা ঃ সুন্দর পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। এমন নয় যে এক কলসী জলের জন্য এক ঘন্টা লাইন দিয়ে থাকতে হবে। শৌচস্নান, কাপড় ধোওয়া, চাষ-আবাদের জন্য যথেষ্ট জল ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা ৬।১৮৫) কু-গ্রাম অর্থাৎ মনুষ্য বাসের অযোগ্য গ্রামের কথা উল্লেখ আছে। যেখানে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান সেটাই সু-গ্রাম বলে আচার্যগণ ব্যাখ্যা করেন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

গোপকুমারের গোলোক বৃন্দাবন যাত্রা

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

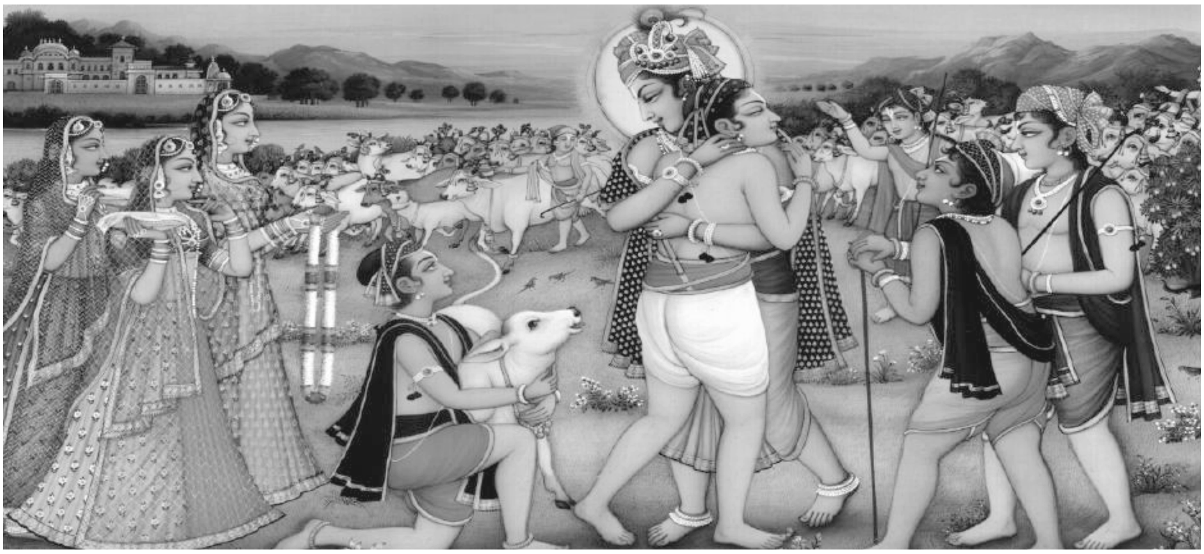

বৃহৎ-ভাগবতামৃত অপূর্ব রূপে গোপকুমারের গোলোক বৃন্দাবন যাত্রাটি বর্ণনা করে, ঠিক আমার এবং আপনার মতোই গোপকুমারের এই জড়জগতে যেখানে আমি আপনি বাস করি তিনিও সেখানে বাস করেন। কিন্তু গোপকুমারের চেতনা আমাদের মতো নয়, তিনি মনস্থ করেছিলেন যে এই জড়জগত পরিত্যাগ করে তাকে চিন্ময় জগতে ফিরতে হবে। তাঁর ঈপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছানর পর তিনি যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন তা ভাষায় অবর্ণনীয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর অনবদ্য রচনা বৃহৎ-ভাগবতামৃতে গোপকুমারের এই গোলোক বৃন্দাবন যাত্রাটি বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। গোলোক বৃন্দাবন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবাস।

এই গ্রন্থের প্রতিটি অংশ তার যাত্রাকালীন অনুভবের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রদান করে। গ্রন্থটি আমাদের মনকে অবরুদ্ধ করে গোপকুমারের যাত্রার সঙ্গী হতে উৎসাহিত করে।

জড়জগতে আমাদের অসীম যাত্রা—

এই পৃথিবীতে আমরা এক সীমাহীন যাত্রা করছি। এই জড়জগতে আমরা অগণিত বৎসরকাল শ্রীকৃষ্ণ হতে দূরে ভ্রাম্যমান রয়েছি।

কখনও মনুষ্যশরীরে, আবার কখনও মনুষ্যেতর যোনীতে ভ্রমণ করি। কখনও ভূমিতে, কখনও জলে, আবার কখনও অন্তরীক্ষে বাস করি।

আমাদের যাত্রাপথের ক্ষণিক সুখ আনন্দের পরিবর্তে অধিক হতাশা নিয়ে আসে।

সাগরের জল যেমন তৃষ্ণা নিবারণে অক্ষম সেইরূপ এই পৃথিবীর মোহ আমাদের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে পারে না।

এই জগতের অস্থায়ী সম্বন্ধ—

এই যাত্রাকালে আমরা অন্যান্য যাত্রীদের সংস্পর্শে আসি। আমরা তাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, শত্রু এবং মিত্র প্রভৃতি রূপে অভিহিত করি। তাদের সঙ্গ পছন্দ করি। চিরকাল তাদের বাসের অভিলাষ রাখি।

কিন্তু যেমন আবেগহীন সাগরের ঢেউ বালিঘর ভেঙ্গে দেয় তেমনই আমাদের ক্রন্দনে অপরিবর্তিত থেকে অপরাজেয় সময় আমাদের সকল স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে প্রিয়জনদের আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এই হলো জগতের প্রকৃতি। সৃষ্টির উষালগ্ন হতে এই জগত এইরূপে ক্রিয়াশীল।

কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই আমাদের সাবধান করেছেন—

এই জগতের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সতর্ক করেছেন যে সমগ্র জড়জগতের কোথাও কেউ নিত্য সুখ ভোগ করতে পারে না, সর্বত্র দুঃখ বর্তমান, কারণ মৃত্যু সর্বত্রই রয়েছে। (গীতা ৮/১৫)

কিন্তু জড়জগত থেকে দূরে রয়েছে চিন্ময় জগত যা ক্ষণিক নয়, নিত্য। সেই জগতে কোন মৃত্যু নেই এবং সেই

জগত যন্ত্রণামুক্ত।

সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের চিন্ময় জগতে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর রচনায় সহস্রবার চিন্ময় জগতে প্রত্যাবর্তনের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন যার নাম ব্যাক্ টু গড্‌হেড (ভগবৎদর্শন)।

সমুদ্র হতে বিচ্ছিন্ন মৎস্য যেমন সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত থাকে অনুরূপভাবে আমরা যতদিন আমাদের নিত্যধাম হতে বিচ্ছিন্ন থাকব ততদিন আমরা যন্ত্রণাভোগ করতে থাকব। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যে নিত্যবাসের সুযোগ আমরা প্রত্যেকেই পাই।

গোপকুমার চিন্ময় জগতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন—

যখন গোপকুমার সুযোগ পান তিনি তা গ্রহণ করেন। উৎসাহে, প্রত্যয়ে এবং পূর্ণ বিশ্বাসে তিনি তাঁর অন্তিম গন্তব্য স্থলের অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন।

গোলোক বৃন্দাবনের পথে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর লোকে গমন করেন। কিন্তু সেখানে তিনি সুখী হননি। সেইহেতু তিনি সেখান থেকে চিন্ময় লোকে যাত্রা করেন। তিনি চিন্ময় লোকের বিভিন্ন গ্রহে গমন করেন। তিনি বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা এবং দ্বারকায় যান। চিন্ময় ধামে তিনি চিন্ময় লোকের অধিবাসীদের সাথে মিলিত হন যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ন্যায় উজ্জ্বল এবং পরম আনন্দময়। সেখানে তিনি অশেষ আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং পূর্ণ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হন।

কিন্তু তথাপিও তিনি কিছুর অভাব বোধ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভাব বোধ করেন। তাঁর হৃদয়ে অপ্রাপ্তির স্পর্শ ছিল। তাঁর হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করছিল। তিনি আন্তরিকভাবে গোলোক বৃন্দাবনে যেতে চাইছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের অভিলাষ কিভাবে পূরণ না করে থাকেন! মন অপেক্ষা অধিক গতিতে ধাবমান এক দিব্য রথ এক অপরূপ পথে গোপকুমারকে চিন্ময় লোকের সর্বোচ্চ লোকে সেই মহিমান্বিত ধামে নিয়ে যায়।

গোপকুমারের গোলোক বৃন্দাবনে আগমন—

সাধু ও ঋষিগণ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন এই ধামের এক পলক দর্শন লাভের আশায়। গোলোক বৃন্দাবনের সেই মহিমান্বিত ধামে গোপকুমারের হৃদয়ের পরম সন্তোষ প্রাপ্তি হলো। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধ্যানে রত হয়েছিলেন। তিনি সর্বাধিক উন্নত ভক্ত ব্রজবাসীদের দর্শন করে তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করলেন।

কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণভাবনায় এমন নিমগ্ন ছিলেন যে তাঁরা ঠিক মতো কথা বলতে পারছিলেন না। গোপকুমার গোপরাজ নন্দের প্রাসাদ লক্ষ লক্ষ অত্যাশ্চর্য বস্তু দর্শন করলেন।

প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে গোপকুমার এক বৃদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বলেন, "যিনি আমাদের হৃদয় হরণ করেছেন, তিনি প্রভাতেই তাঁর সখা ও গাভী সমভিব্যাহারে বনে লীলাবিলাসের জন্য গমন করেছেন।"

এই জগতের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সতর্ক করেছেন যে সমগ্র জড়জগতের কোথাও কেউ নিত্য সুখভোগ করতে পারে না, সর্বত্র দুঃখ বর্তমান, কারণ মৃত্যু সর্বত্রই হয়েছে। (গীতা ৮/১৫) কিন্তু জড়জগত থেকে দূরে রয়েছে চিন্ময় জগত যা ক্ষণিক নয়, নিত্য। সেই জগতে কোন মৃত্যু নেই এবং সেই জগত যন্ত্রণামুক্ত।

ব্রজবাসীগণের বিরহের হতাশা

শ্রীকৃষ্ণের অসহনীয় বিরহে অধীর ব্রজবাসীগণ অতিকষ্টে সমস্ত দিন অতিবাহিত করতেন। তাদের যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত কেউ কেউ তাঁর বিভিন্ন লীলার স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। কেউ বা তাঁর বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ে সঙ্গীত রচনা করে সমস্ত দিন গাইতেন।

তিনি প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথেই তাঁকে সুস্বাদু ভোজন পরিবেশনের জন্য অনেকেই ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত থেকে সকলেই তাঁদের আবেগ

লুকানোর সর্বোত্তম প্রয়াস করতেন, কিন্তু তাঁদের আঁখি তাঁদেরকে ছলনা করত, দুই চক্ষু দিয়ে ক্রমান্বয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত এবং ভগ্নকণ্ঠে তাঁরা ডাকতেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

তাঁরা আনন্দে আছেন কি যন্ত্রণায় আছেন এটি উপলব্ধি করা কারোর পক্ষেই কঠিন ছিল। তাঁরা কি কৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছেন, না কৃষ্ণ বিরহে আছেন?

ব্রজবাসীগণ যমুনাতীরে কৃষ্ণের আশায় প্রতীক্ষা করতেন—

তাঁরা বন হতে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের আশায় অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতেন। সন্ধ্যা হতেই সকলে পাগলের ন্যায় যমুনাতীর অভিমুখে দৌড়ে যেতেন। তাঁদের দৃষ্টি একভাবে বনের দিকে নিবদ্ধ থাকত এবং তাঁরা কৃষ্ণের জন্য অধীর আগ্রহে প্রয়াস করতেন যাতে চোখের পলক না পড়ে।

অকস্মাৎ চতুর্দিক বাঁশির সুরেলা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। যমুনার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। উড়ন্ত পাখীরা স্থির হয়ে যায়। সুন্দর ফুলে সুসজ্জিত বৃক্ষরাজি তাদের হস্ত প্রসারিত করে ধ্বনিকে স্বাগত জানায়। আবেগে উদ্বেলিত হয়ে কতিপয় ব্রজবাসী মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ ধ্বনির দিকে দৃক্‌পাত করার প্রয়াস করলেও অশ্রু তাদের দৃষ্টি অস্পষ্ট করে দেয়। কেউবা স্থানুবৎ দণ্ডায়মান থাকে।

সুস্বাদু পদযুক্ত পাত্র নিয়ে গোপীগণ দ্রুত দৌড় দেয়। কেউবা ভূমিতে পতিত হয় এবং বিরহের প্রবল বেদনায় বারংবার ক্রন্দন করে। নন্দমহারাজসহ যশোদা, সখীগণসহ রাধারানী এবং অন্যান্যরা দর্শন লাভের জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ এলেন!

অকস্মাৎ পীতবসনধারী এক নীলবরণ বালক আবির্ভূত হয়। বন ফুলে সুসজ্জিত তিনি শিখিপাখার মুকুট শিরে ধারণ করেছেন। নীলবালকটির মধ্যে ধৃত সৌভাগ্যবান বাঁশিটি আনন্দে নৃত্য করে সকলকে কৃষ্ণের আগমনবার্তা জানালো। এখন উৎসবের সময়।

শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত। সারাদিন কাজের পর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেছেন। কিন্তু হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বহুগুণে বর্ধিত হলো।

বহুদিন পরে কৃষ্ণ গোপকুমারের সাথে মিলিত হলেন—

যমুনাতীরে একত্রিত ব্রজবাসীগণের মধ্যে তিনি গোপকুমারকে দেখলেন। তিনি বংশী বাদন স্তব্ধ করে দিলেন। তাঁর সখা এবং গাভীদের ছেড়ে, এবং সকলকে বিস্মিত করে তিনি তার দিকে উন্মত্তবৎ দৌড়ে এলেন।

তিনি লাফিয়ে গোপকুমারের কাছে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। বহুদিন পর তাঁর প্রিয় সখাকে দেখে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে স্বরূপের বাহুতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

চেতনা ফিরলে কৃষ্ণ গোপকুমারের হস্ত নিয়ে তাঁর বাম হস্তপদ্মে রাখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেমন আছ? আমি তোমার অভাব অত্যন্তভাবে অনুভব করেছি স্বরূপ। প্রতিদিন আমি এই আশায় অপেক্ষা করতাম যে একদিন তুমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। অনেক ধন্যবাদ। আমি কৃতজ্ঞ। তুমি ফিরে এসেছ। এখন এখানে থাকো। আর কোথাও যেও না।"

চিন্ময় জগতে গোপকুমারের নাম স্বরূপ। যদিও তার স্বরূপ নাম গোপকুমার বিস্মৃত হয়েছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তা স্মরণে রেখেছেন আনন্দে। শ্রীকৃষ্ণের সাথে স্বরূপের পুনর্মিলন হলো এবং তাঁর চিন্ময় পরিবারের সঙ্গে নিত্যকাল আনন্দ চিন্ময়ধামে বাস করবেন।

চিন্ময় জগতে কোন উৎকণ্ঠা, কোন ভয় নেই এবং পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা থেকে এই লোক মুক্ত।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে আমাদের জন্যও এই পরিণতি অপেক্ষা করে আছে।

বৃহদ্ ভাগবতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিস্তারিতভাবে গোপকুমারের গোলোক বৃন্দাবনে যাত্রার বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি আপনাকে এবং আমাকেও এই যাত্রার প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আপনি কি প্রস্তুত?

পাঁচমিশালী ঘন্ট

উপকরণ ঃ পটল ৫টি। আলু ১টি। রাঙালু ১টি বড়। বেগুন বড় ১টি। ঝিঙে ২টি। সিম ৮টি। মিষ্টি কুমড়ো অল্প। কাঁচা পেঁপে ছোট ১টি। মূলো ছোট ২টি। কাঁঠালের বীজ ৩-৪টি। ছোলার ডাল ১০০ গ্রাম। লবণ ও হলুদ পরিমাণ মতো। কাঁচা লংকা ৫টি। শুকনো লংকা ২টি। তেজপাতা ৪টি। আদাবাটা ৩ চা-চামচ। পাঁচফোড়ন ২ চা-চামচ। সরষে তেল ২০০ গ্রাম। কালো সরষে ৩ চা-চামচ এবং রাধুনী ২ চা-চামচ শুকনো কড়াইতে ভেজে গুঁড়ো করা।

রন্ধন প্রণালী ঃ পেঁপে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে মিহি করে আমান্য করে নিন। বেগুন, পটল, আলু, মিষ্টি আলু, ঝিঙে, সিম, কুমড়ো, মূলো, কাঁঠাল বীজ—সব সবজী ধুয়ে আমান্য করে রাখুন।

ডাল ২ ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখে তারপর বেটে নিন। উনানে কড়াই গরম হলে তাতে তেল দিন। তাতে ডাল বাটা অল্প অল্প নিয়ে হাতে চ্যাপটা করে বড়া বানিয়ে ভেজে তুলে নিন।

একটা বড় পাত্রে সবজিগুলোতে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে দিন। সবজিগুলো সব আলাদা আলাদা করে তেল কড়াইতে ভেজে তুলে রাখুন।

এবার বাকি তেল কড়াইতে দিয়ে শুকনো লংকা তেজপাতা, পাঁচফোড়ন, আদাবাটা, চেরা কাঁচালংকা দিন। খুনতিতে নাড়িয়ে দিন। সব সবজিগুলো তাতে ঢেলে দিন। প্রয়োজনে নুন হলুদ ও জল দিয়ে নাড়িয়ে দিন। ঢাকনা চাপা দিন। দু-তিন মিনিট পরে পরে ঢাকনা খুলে দেখুন সবজিগুলি সব সেদ্ধ হয়েছে কিনা। সেদ্ধ হয়ে গেলে সামান্য চিনি, সরষে গুঁড়ো, রাধুনী গুঁড়ো দিয়ে দিন।

তারপর ভেজে রাখা ডালবড়াগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে দিন।

গরম গরম এই পাঁচ মিশালী ঘন্ট অন্নের সাথে থালা বাটিতে সাজিয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

অর্জুনের প্রথম প্রশ্ন

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

হরেকৃষ্ণ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় অর্জুন আমাদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য সমগ্র গীতায় ১৬টি প্রশ্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর অর্জুনের মাধ্যমে আমাদের প্রদান করেছিলেন। আমরা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব মাত্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের প্রথম প্রশ্ন

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।।"
(গীতা ২/৫৪)

অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলা বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন?

অর্জুন ভগবানকে 'কেশব' বলে সম্বোধন করে চারটি প্রশ্ন করেছেন একই সঙ্গে। 'কেশব' কথাটি কেন সম্বোধন করলেন। উত্তরঃ ক, অ, ঈশ, এবং ব—এই চার অক্ষর মিলে 'কেশব', অতএব ক—ব্রহ্মা, অ—বিষ্ণু, ঈশ—শিব এই তিনটি যাঁর ব—বপু বা শরীর তাঁকে কেশব বলা হয়। এখানে অর্জুন ভগবানকে 'কেশব' নামে সম্বোধিত করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে আপনি সমস্ত জগতের সৃজন, সংরক্ষণ এবং সংহারকারী, সর্বশক্তিমান সাক্ষাৎ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান; সুতরাং আপনিই আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—

অর্জুন এই রকম প্রশ্ন কেন করলেন? কারণ অর্জুন যখন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়েও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম থেকে বিরত হয়ে যুদ্ধ করবেন না বলে গাণ্ডীব রেখে দিলেন তখনই ভগবান গীতার জ্ঞান শোনাতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে গীঃ ২।১৭-২৯ নং দেহ ও আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করলেন এবং অর্জুনের 'পাপের ভয়' ভগবান সুন্দরভাবে

(২।৩৩-৩৭ গীতা) খণ্ডন করেছেন। অর্জুনের 'কুল নাশ' এর ভয় ছিল, ভগবান তা (২।৪৪-৪৬নং গীতা) সুন্দর ভাবে খণ্ডন করে বুঝিয়েছেন— ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, যারা ভোগ এবং ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না। তাই ঐশ্বর্যসুখে আসক্ত না হয়ে ত্রিগুণের উর্ধ্বে উঠ তা হলে বেদের উদ্দেশ্য কি জানতে পারবে। আর তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না এবং আত্ম উপলব্ধির সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হবে। (গীতা২।৫৩।)

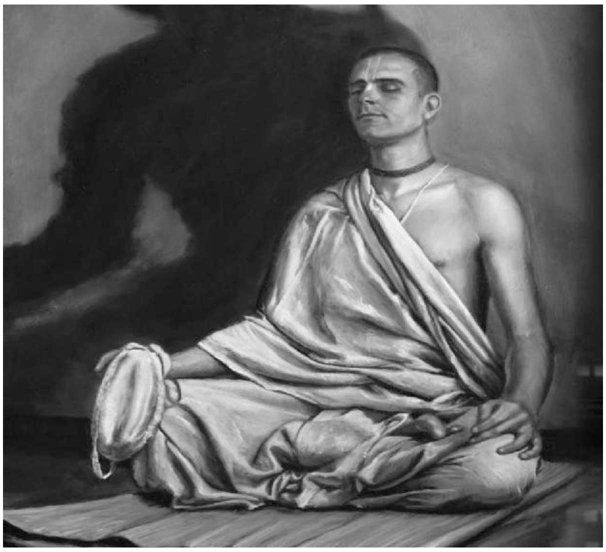

পূর্ব শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে, তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে অচল ভাবে স্থির হয়ে যাবে, তখন তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হবে। সেই জন্য অর্জুন এখানে ভগবানের কাছে সেই পুরুষের লক্ষণ জানতে চেয়েছেন; যিনি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায়ময় হয়েছেন এবং যাঁর বুদ্ধি সম্পূর্ণ পরমাত্মাতে বা কৃষ্ণভাবনায় চিরতরে অচল ও স্থির হয়েছেন—এই ভাবটি প্রকাশ করার জন্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য এর সাথে 'সমাধিস্থস্য' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

যিনি সমাধির চরম স্তরে উপনীত হয়েছেন এবং যাঁর বুদ্ধি স্থির সেই রকম মানুষের লক্ষণ কি?

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রশ্নগুলি সাধারণ কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীর, 'কা ভাষা' কি লক্ষণ। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—(১) তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথাই বলেন না। এছাড়া (২) তিনি সমস্ত প্রকার ভয় থেকে মুক্ত, (৩) কৃষ্ণভাবনাময় কার্যে এমন ভাবে ব্যস্ত থাকেন যে তাঁর ভৌতিক শরীর সম্বন্ধে ধ্যান থাকে না। (৪) যেমন একজন যুবক একজন যুবতী একে অন্যের সঙ্গ প্রভাবে সুখ প্রাপ্ত হয়—ঐ রকম সব সময় শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে ও শ্রবণ করে সুখ প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ''স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত'' কৃষ্ণভাবনায় স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন, ''সততং কীর্তয়ন্তো মাং'' সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করেন, যে কোন কথা বলেন শাস্ত্র থেকে বলেন এবং স্থান কাল পাত্র হিসেবে বলেন শ্রোতার অনুকূলে, যেমন শ্রীল প্রভুপাদ যখন প্রথম আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন সর্ব প্রথমে হিপীদের সমাজে প্রচার করছিলেন—তখন তাদের নেশা ছাড়ার কথা একেবারে বলেননি। তিনি বললেন হরেকৃষ্ণ কীর্তনে এমন নেশা আছে যা কখনও নষ্ট হয় না—অন্য নেশা আপনাদের বার বার করতে হবে। তখন তারা সহজে গ্রহণ করলেন। একবার এক ভক্ত একজন বিখ্যাত গাড়ীর চালককে নিয়ে আসেন শ্রীল প্রভুপাদের কাছে। প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কোন্ গাড়ী বাজারে চলছে, কোন্ গাড়ী ভালো, কোন্ গাড়ীর দাম কত? এই ভাবে অনেক সময় ধরে কথা বলার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যখন আপনি জোরে গাড়ী চালান তখন আপনার ভয় লাগে না?—হ্যাঁ ভয় লাগে উত্তর দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণের নাম নিতে হয়---হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়,—ভক্তরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন প্রভুপাদ ঠিকমতো প্রচার করলেন না। কয়েক দিনের মধ্যে ঐ গাড়ীর বিখ্যাত চালকটি হরিনাম করছে মন্দিরে এসে---ভক্তরা দেখে অবাক হলেন।

কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী কথা বলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন ‘কিম্ আসীত’ কিভাবে অবস্থান করেন। এখানে চার ভাবে অর্থ হতে পারে। উনি কি শান্তভাবে অবস্থান করেন; স্থিরভাবে অবস্থান করেন; চুপ-চাপ ভাবে থাকেন, না গম্ভীর ভাবে অবস্থান করেন।

কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ পরম ভোক্তা, শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর ও শ্রীকৃষ্ণ পরম মিত্র জেনে শান্ত ও নির্ভয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ অস্থির-চঞ্চল মনকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। তৃতীয়তঃ কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি প্রয়োজনে কথা বলেন। যেমন জড়ভরত প্রয়োজনে রহুগণ রাজার কাছে মুখ খুললেন—অন্যথায় চুপ-চাপ ছিলেন। চতুর্থতঃ সমুদ্রকে উপর থেকে দেখলে জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, কিন্তু সমুদ্র কত গভীর ঐ সমুদ্রের মধ্যে কত জীবজন্তু আছে এবং মূল্যবান রত্ন আছে, এই কথা খুব কম লোকেই জানে, ঠিক তেমনি কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির অন্তর কত সরল ও সাধারণ দেখা যায়। উপরন্তু কৃষ্ণকে খুশী করার জন্য হৃদয় থেকে কত যোজনা তৈরী করেন। যেমন শ্রীল প্রভুপাদকে বাইরে থেকে দেখলে একজন—সরল সাদাসিধে বৈষ্ণব বলে মনে হতো কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে কত যোজনা লুকিয়ে ছিল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত বাসনা বাস্তবায়িত করেছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ‘‘কিমাসীত ব্রজেত’’ কিভাবে বিচরণ করেন। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যান এবং তাঁর শ্রীচরণকমলে শরণ গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, ‘‘সাধুর বেশে শত্রু’’ বহু ব্যক্তি, সমাজ থেকে বহু বাধা এলেও শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ভুলে যান না। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করেন স্থানকে পবিত্র করার জন্য, যেমন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এক একটি বাড়ীতে গো দহন কাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন ঐ বাড়ীটিকে পবিত্রকরণ করার জন্য প্রচার করার জন্য—যেমন শ্রীল প্রভুপাদ এত বৃদ্ধাবস্থায় কেন বিদেশে গিয়েছিলেন মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য। বিভিন্ন তীর্থ স্থান দর্শন করার জন্য বিচরণ করেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি।

এখন আমরা আলোচনা করবো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

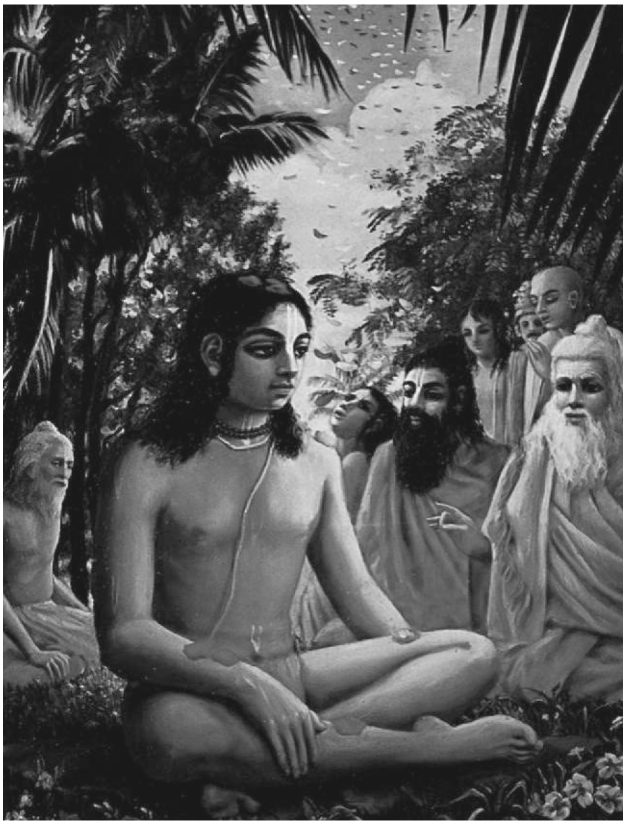

অর্জুনের প্রশ্নের কিভাবে উত্তর দিচ্ছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর গীতার ৫৫নং শ্লোকের মাধ্যমে দিয়েছেন।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। (২।৫৫)

কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ পরম ভোক্তা, শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর ও শ্রীকৃষ্ণ পরম মিত্র জেনে শান্ত ও নির্ভয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ অস্থির-চঞ্চল মনকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। তৃতীয়তঃ কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি প্রয়োজনে কথা বলেন।

পরমেশ্বর ভগবান বললেন,—হে পার্থ! জীব যখন মানসিক জল্পনা-কল্পনা থেকে উদ্ভুত সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করে এবং তার মন যখন এভাবে পবিত্র হয়ে আত্মাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্ত লাভ করে, তখনই তাকে স্থিত প্রজ্ঞ বলা হয়। প্রথমেই ভগবান ‘হে পার্থ’ বলার মাধ্যমে অর্জুনকে জানিয়ে দিয়েছেন তোমার মা পৃথা বা কুন্তী দেবী উনিও পরিপূর্ণ একজন যোগী কারণ তাঁর অন্তরে কোন ভৌতিক কামনা-বাসনা ছিল না। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ বা ভগবদ্ভক্তের

মধ্যে মহৎ মুনি-ঋষিদের সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। যারা ভগবদ্ভক্ত নয় তারা সীমিত মনের জল্পনা কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে উদ্ভূত কাম সহজেই পরিত্যাগ করে আত্মাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকেন।

ভগবান অর্জুনকে বোঝাতে চাইলেন, সমাধি মানে নিষ্ক্রিয় নয়, উনি সব সময় ভগবানের সেবায় সক্রিয় থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ২।৫৬ নং এবং ৫৭নং শ্লোকের মাধ্যমে দিয়েছেন, প্রশ্ন ছিল উনি কিভাবে কথা বলেন? ভগবান সর্বপ্রথমেই বলছেন, ''দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ'' ত্রিতাপ দুঃখ উপস্থিত হলেও যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না। একজন কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ত্রিতাপ ক্লেশের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা বলে মেনে নেন। সেই জন্য তিনিও পূর্ণ যোগীর মতো রাগ ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত। তিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না। কারণ তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এই জগৎ আপেক্ষিক এবং দ্বন্দ্ব ভাবের দ্বারা পরিপূর্ণ। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভগবান গীতা ২।৫৮ এবং ৫৯ নং শ্লোকে। প্রশ্নঃ তিনি কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি কিভাবে অবস্থান করেন তা একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কচ্ছপ যেমন তার চারটি পা ও একটি মাথা প্রয়োজনে বার করে, আর যখন বিপদ দেখে তার মধ্যে গুটিয়ে নেয়, তেমনি স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরও পাঁচ ইন্দ্রিয় প্রয়োজনে কাজে লাগায় এবং অপ্রয়োজনে গুটিয়ে নেয়। কিভাবে এটি সম্ভব করেন পূর্ণযোগী বা কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি? ''হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে'' সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করার মাধ্যমে। এছাড়া ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তরে স্বাদ আস্বাদন করার ফলে একজন ব্যক্তি জড় বিষয় তৃষ্ণা চিরতরে নিবৃত্ত করতে পারে। অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন—তিনি কিভাবে বিচরণ করেন? ভগবান গীতার ৬৪নং শ্লোকে উত্তর দিয়েছেন—সংযতচিত্ত ব্যক্তি প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্ত এবং অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থাকার ফলে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নেই তার চিত্ত সংযত থাকে না—ফলে প্রকৃত সুখও পায় না।

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম পর্ব ঃ ''ভাগবত মহিমামৃত''

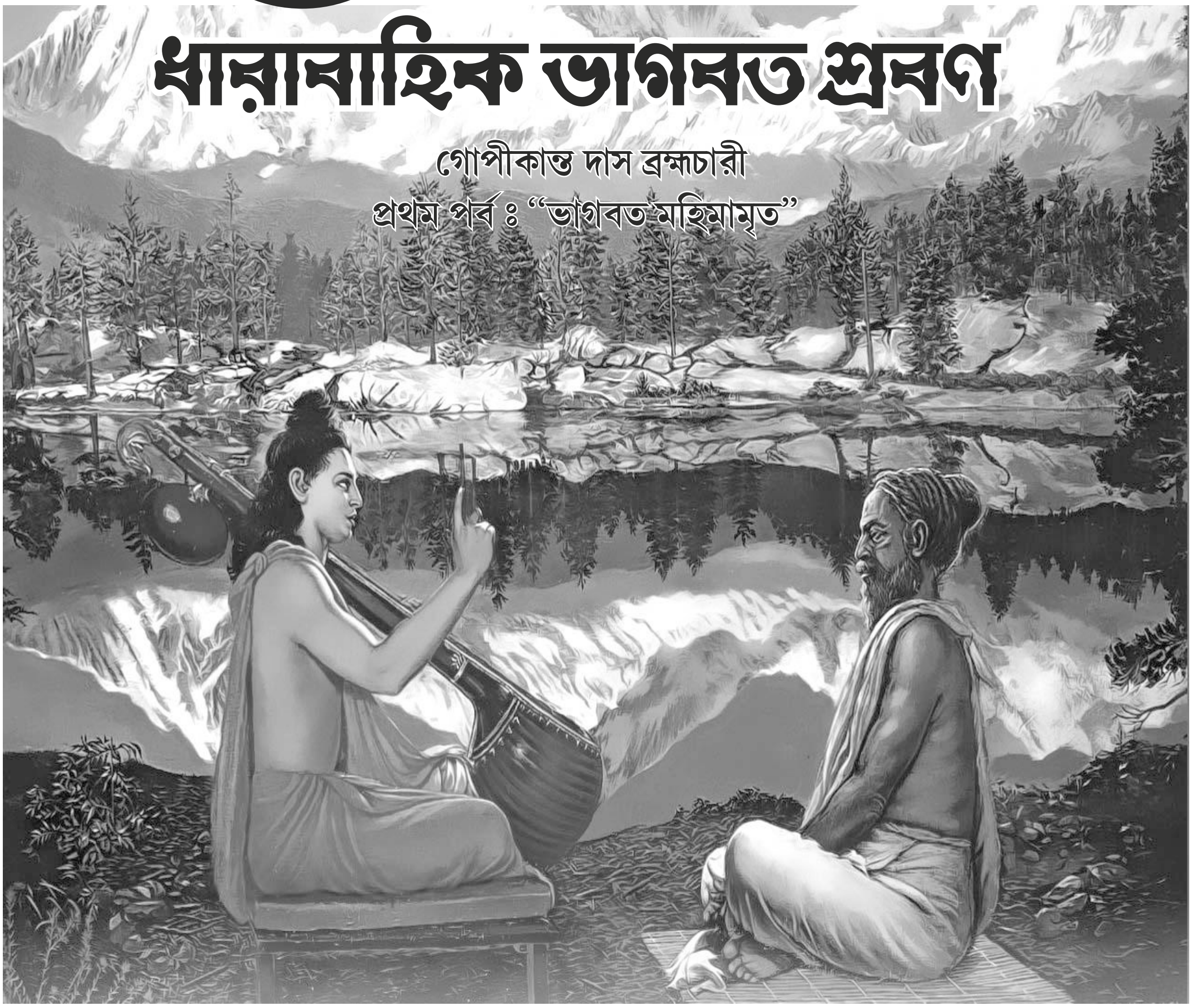

ভূমিকা ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, ''মানব সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনটি শ্রীমদ্ভাগবত মেটাতে পারে, কেননা এটি হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের ভগবৎ চেতনার পূর্ণবিকাশের এক সাংস্কৃতিক অবদান।''

ভাগবত মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—

বিদ্যা প্রকাশো বিপ্রানাং রাজ্ঞা শত্রু জয়ো বিশাস্।
ধনং স্বাস্থ্যং চ শূদ্রানাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ ভবেৎ।।

ভাগবত অধ্যয়নের দ্বারা ব্রাহ্মণ বিদ্যা লাভ করতে পারেন, ক্ষত্রিয় শত্রু জয় করতে পারেন, বৈশ্য অর্থ লাভ করতে পারবেন এবং শূদ্র স্বাস্থ্য লাভ করতে সক্ষম হবেন।

ভাগবত কি?

অর্থেহয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপহসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।।

এই ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য দ্বারা সম্বর্ধিত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে,—

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ।।
(ভাঃ ১২/১৩/১৫)

সর্ব বেদান্তের সারকেই ভাগবত বলা হয়। যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্তি লাভ করেছেন তার অন্য শাস্ত্রে রুচি থাকে না।

কিভাবে ভাগবত প্রকাশিত হলো? সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদি কবি ব্রহ্মাকে চারটি শ্লোকের দ্বারা

ভাগবত প্রদান করেন। ব্রহ্মা নারদ মুনিকে প্রদান করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র রচনা করেও যখন শান্তি পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির শরণাপন্ন হলে, নারদ মুনি তাঁর অসন্তোষের মূল কারণ চিহ্নিত করে বলেন, তুমি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করনি। নারদমুনির নির্দেশে ব্যাসদেব এই অপ্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ব্যাসদেবের নিকটে তাঁর পুত্র শুকদেব গোস্বামী ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর মৃত্যুর সাত দিন পূর্বে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে এই ভাগবত শ্রবণ করে ভগবত ধামে গমন করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী যখন পরীক্ষিৎ মহারাজের উদ্দেশ্যে ভাগবত কীর্তন করেছিলেন, সেই সভায় শ্রীল সুত গোস্বামীও শ্রদ্ধা সহকারে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে নৈমিষারণ্যে ঋষিরা যখন এক হাজার বৎসর ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন সেখানে তাঁরা সুত গোস্বামীকে সাদরে বরণ করে কলিযুগের দুর্লঙ্ঘ সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে তাঁকে ছয়টি প্রশ্ন করেছিলেন। যার ধারাবাহিক বিবরণ আমরা পরবর্তী পর্বে শ্রবণ করব।

ভাগবতে কি বর্ণনা করা হয়েছে? ভাগবতে ১২টি (দ্বাদশ) স্কন্ধ, (১৮,০০০) আঠারো হাজার শ্লোক এবং ৩৩৫টি অধ্যায় রয়েছে।

১ম স্কন্ধে—রয়েছে—১৯টি অধ্যায়
২য় স্কন্ধে—রয়েছে—১০টি অধ্যায়
৩য় স্কন্ধে—রয়েছে—৩৩টি অধ্যায়
৪র্থ স্কন্ধে—রয়েছে—৩১টি অধ্যায়
৫ম স্কন্ধে—রয়েছে—২৬টি অধ্যায়
৬ষ্ঠ স্কন্ধে—রয়েছে—১৯টি অধ্যায়
৭ম স্কন্ধে—রয়েছে—১৫টি অধ্যায়
৮ম স্কন্ধে—রয়েছে—২৪টি অধ্যায়
৯ম স্কন্ধে—রয়েছে—২৪টি অধ্যায়
১০ম স্কন্ধে—রয়েছে—৯০টি অধ্যায়
১১শ স্কন্ধে—রয়েছে—৩১টি অধ্যায়
১২শ স্কন্ধে—রয়েছে—১৩টি অধ্যায়

ভাগবতের দশটি বিষয় রয়েছে (১) সর্গ (২) বিসর্গ (৩) স্থান (৪) পোষণ (৫) উতি (৬) মন্বন্তর (৭) ঈশানুকথা (৮) নিরোধ (৯) মুক্তি এবং (১০) আশ্রয়। এই দশটি বিষয় বা লক্ষণের বর্ণনা ভাগবতের ২য় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণনা রয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলছেন,

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন---এই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয় এই দশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

ইসকন মায়াপুরে গোবর্ধন পূজা সাড়ম্বরে পালিত হলো

মায়াপুরের ভক্তগণ শ্রীগোবর্ধন অভিষেক, গোবর্ধন লীলাকথা, অন্নকুট এবং গোবর্ধন পরিক্রমার মাধ্যমে চমৎকার ভাবে গোবর্ধন পূজা উৎসব পালন করলো। ভোর সাড়ে চারটায় মঙ্গল আরতি সহযোগে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং পরে শ্রীমৎ ভক্তিবিঘ্ন বিনাশক নৃসিংহ স্বামী মহারাজ সকাল সাতটায় ভাগবতম ক্লাস দেন। ভাগবতম ক্লাসের পর ৮টায় দর্শন আরতির জন্য ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীবিগ্রহগণ নিত্য সময়ের মতোই উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সেখান থেকে তাঁদের করুণা কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। একটি বড় টেবিলের উপর শ্রীবৃন্দাবনের গোবর্ধন গিরি, তার মধ্যে বিভিন্ন কুণ্ড, গাছপালা, পশুপাখী, মন্দির, পথঘাট প্রভৃতি স্মৃতি স্থান সমন্বিত সুদৃশ্য গোবর্ধন প্রতিকৃতি বানিয়ে ছিলেন শচীদেবী দাসী প্রমুখ মাতাজীরা।

ভক্তগণ গোবর্ধন পরিক্রমার সময় সমস্ত কোভিড সুরক্ষা নির্দেশাবলী পালন করেছিলেন তথাপি তা সুমধুর কীর্তন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল যা এক অদ্ভুত মহিমান্বিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

ঠিক এগারটার সময় অভিষেক শুরু হয় এবং পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যাপী চলেছিল। সমস্ত ভক্তগণ অভিষেক উৎসবে মগ্ন ছিলেন। তা পূর্ণ মহোৎসবে পরিণত হয় যখন অনবদ্য সহস্রধারা অভিষেক শুরু হয়। অভিষেক অনুষ্ঠান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্নকূট ভোগ নিবেদন এবং মহা আরতি করা হয়। উপস্থিত অতিথি দর্শনার্থীদের অন্নকূটের অন্ন ব্যঞ্জন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া কম্যুনিকেশনের নির্দেশক ভগবদ্‌গীতা চিত্র প্রদর্শনীর চিত্র অঙ্কন করছেন

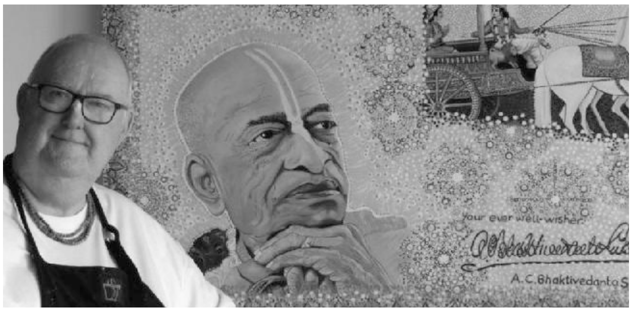

নিজস্ব কম্যুনিকেশন সার্ভিসে পার্ট টাইম কাজ করার পর অস্ট্রেলিয়ার ইসকন কম্যুনিকেশনের নির্দেশক ভক্ত দাস তার জীবনের শেষ বেলায় তার অবসর সময়কে একটি শৈল্পিক স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজে নিয়োজিত করছেন যা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে।

ভক্ত দাস বলছেন, "১৯৭০ সালে আধ্যাত্মিক ভক্তিজীবনে প্রবেশের পূর্বে আমি মেলবোর্ণ ইউনিভার্সিটিতে ফাইন আর্টের উপর ডিপ্লোমা করেছিলাম।"

তিনি কুড়িটি সমকালীন আকোধর্মী চিত্রের একটি সিরিজ সৃষ্টি করছেন যা ভগবদ্‌গীতার প্রতি অধ্যায়ের পর্যায়ক্রমে একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপিত করবে। প্রতিটি ২×১.৫ মিটারের বিশাল আশ্চর্য মহিমামণ্ডিত চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হতে তিন বৎসর সময় লাগবে এবং তারপর এগুলি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হবে।

ভক্ত দাস প্রতি চিত্র সম্পূর্ণ করতে দুই থেকে তিন মাস সময় নেন, এবং তিনি অনুমান করছেন যে ২০২৩ সালে এই সিরিজটি সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পত্নী ভক্তি দাসী এখন এই প্রকল্পের ওয়েবসাইট, ফোটোগ্রাফ এবং পৃষ্ঠপোষকতার তদারকিতে ব্যস্ত। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশ যেখানে তারা বাস করেন সেখানে সকল কম্যুনিটি সেন্টারগুলিতে এক ভ্রাম্যমান চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া যদি বর্তমান মহামারী পরিস্থিতিতে অনুমোদিত হয় তাহলে তারা দেশব্যাপী এমনকি আন্তর্জাতিকভাবেও প্রদর্শনী করতে আগ্রহী।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম দিকের শিষ্য ভক্তিমাধুর্য গোবিন্দ গোস্বামী অপ্রকট হলেন

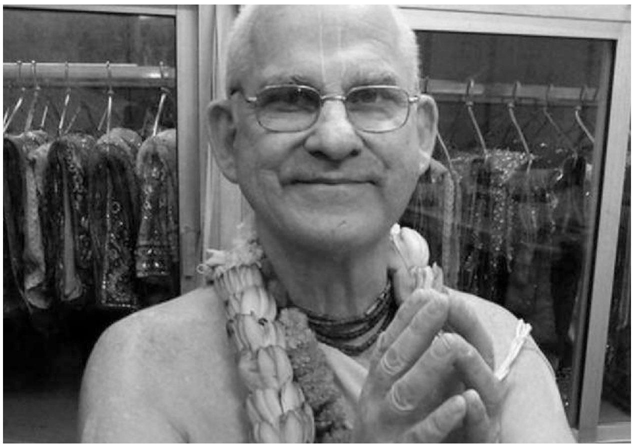

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম দিকের শিষ্য শ্রীমদ ভক্তিমাধুর্য গোস্বামী মহারাজ ১৪ই নভেম্বর, ২০২০ সকাল ৬টার সময় দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক এবং সারভাইকাল স্পনডেলাইটিস জনিত শল্যচিকিৎসা জটিলতা ইত্যাদিতে অপ্রকট হন, তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। হাসপাতাল থেকে ইসকন পাঞ্জাবী বাস মন্দিরে যেখানে তিনি বিগত পনের বৎসর অবস্থান করছিলেন সেখানে স্থানান্তরের পূর্বে তার কোভিড নেগেটিভ রির্পোর্ট পাওয়া যায়। একটি আইসিইউ সুবিধা সমন্বিত কক্ষ এবং পূর্ণ সময়ের জন্য সেবক নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের জপ নিরন্তর চলছিল।

সম্প্রতিকালে তার সুষুম্নাকাণ্ডে জটিলতা হওয়ার কারণে মহারাজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে দিল্লির রাজীব গান্ধী ক্যান্সার হাসপাতালে জটিল অস্ত্রপ্রচারের জন্য ভর্তি করা হয়, ডাক্তারা যদিও বলেছিলেন যে এই অস্ত্রপ্রচার সফল হলেও মহারাজের শরীর অসাড় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং সেই কারণে আমাদের উভয় সম্ভাবনা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিমাধুর্য গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজকে ১৯৬৮ সালে অক্টোবর মাসে মাখনলাল দাস নামে দীক্ষা প্রদান করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের ১০০ জন মূল শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তিনি ইসকনে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রচার যা ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি তার গুরুসদন বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার জারি রাখেন। তিনি ১৯৬৯ সালে বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়াতে ইসকন মন্দির স্থাপন করেন, এবং পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে বহু ইসকন কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

ভক্তিমাধুর্য গোস্বামী ২০১০ সালে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং দক্ষিণ দিল্লীর পাঞ্জাবিবাগ ইসকন মন্দিরে অবস্থান করে যেখানে তাঁর অতুল্য সেবা প্রদান ও ভক্তদের অসীম উৎসাহ প্রদান করতে থাকেন। তিনি এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, ভারতবর্ষে, তাঁর বৃদ্ধাবস্থা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও নিরলস প্রচার এবং ভ্রমণের জন্য সর্বজন বিদিত ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর শ্রীজগন্নাথদেব ও নীলমাধবের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি এবং আসক্তি, যে শ্রীবিগ্রহ সর্বদা বহন করতেন তা তাকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রদান করে।

ভার্চুয়াল কার্তিক নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা - ২০২০

কার্তিক নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা ২০২০ যা মায়াপুরচন্দ্র সংগঠিত করেছেন যেটি এই বছর ভার্চুয়াল মাধ্যম দ্বারা ভক্তরা নয়টি দ্বীপ এবং ভারতবর্ষের মায়াপুরের সংলগ্ন আরও বহু তীর্থস্থান দর্শন করতে পারবেন। শ্রীশ্রী গৌর-নিতাইয়ের এবং তাঁদের পার্ষদদের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে অংশগ্রহণ করার ফলে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা আগেই অতি পবিত্র ভজন প্রক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু কার্তিক মাসে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমাতে আরও অধিক মাত্রাতে পারমার্থিক ফল লাভ করা যায়।

প্রবীণ ভক্তগণ যথা শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, জননিবাস প্রভু, পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রভু, ভক্তিপুরুযোত্তম স্বামী মহারাজ এবং আরও অনেকে ভক্তদের এই অনলাইন পরিক্রমাতে দিগ্‌দর্শন করেন।

ভগবদ্গীতা অনলাইন কোর্স ছয় হাজার মানুষকে কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করলো

দৃশ্যত সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল প্রমাণ করে করোনা অতিমারী মানুষের জীবন নিয়েই চলছে। শারীরিক থেকে মানসিক ক্ষতি আরও অধিক হচ্ছে। করোনার কারণে মৃত্যুর হার বেড়েছে, কর্মক্ষেত্রগুলি অর্থনৈতিক কারণে খুলে দেওয়া হয়েছে। করোনা শেষ হয়েছে তার কারণে নয়। এই সমস্ত বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ইসকন চেন্নাই পেরাম্বর ভগবদ্গীতার মহান জ্ঞান বিতরণ করার জন্য ১৮ দিনে আঠোরো অধ্যায় শিক্ষার (১-১৮ই নভেম্বর) এক শিক্ষা ক্রমের আয়োজন করেছে, এই শিক্ষাক্রম মূলত হিন্দি ভাষাভাষীদের জন্য। ২৭শে অক্টোবর নিবন্ধিকরণ শুরু হয়েছিল এবং পাঠ্যক্রম শুরু হওয়ার দিন ছিল পয়লা নভেম্বর। ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে অধিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার প্রভাবে মাত্র চার দিনের মধ্যে ছয় হাজারেরও বেশী ভক্ত সমগ্র বিশ্ব থেকে এই হিন্দি পাঠ্যক্রমের জন্য নাম নথিভূক্ত করেন। এই পাঠ্যক্রমে অন্য ধর্মালম্বী যথা ইসলাম, খ্রীষ্টান, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধরাও অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যক্রমটি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা থেকে নিয়ে ইসকন চেন্নাই-এর দেবশেখর বিষ্ণু দাস এবং তার ভগ্নি পদ্মারাধিকা দেবী দাসী তৈরী করেন। তারা দুজনেই কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করছেন এবং তাদের স্থানীয় ইসকন মন্দিরে বহু সেবা যথা শ্রীবিগ্রহ পূজা, প্রচার, রন্ধন ও গ্রন্থ বিতরণ ইত্যাদি ঐকান্তিকভাবে করেন।

পদ্মারাধিকা দেবী দাসী বলেন, ''আমাদের এই সেবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীল প্রভুপাদের ভগবদ্গীতা যথাযথ শিক্ষাটিকে উপস্থাপন করা, আমরা শুধুমাত্র অধ্যায় মাত্রিক সারাংশ প্রস্তুত করেছি।'' প্রত্যহ এক হাজারেরও বেশী ভক্ত শিক্ষাক্রমটিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং বাকীরা ইউটিউব চ্যানেলে অংশগ্রহণ করেছেন। দেবশেখর বিষ্ণু দাস বলেন, ''আমরা ভেবেছিলাম যেহেতু সময়টি অতি দীর্ঘ এবং বর্তমানে মানুষের কাছে যথেষ্ট সময় নেই তাই শতাধিক মানুষের বেশী মানুষ পঞ্জীকরণ করবে না। কিন্তু আচার্যদেবরা যেমন বলেন যে, মানুষ ভগবানের লীলা কথা শুনতে আগ্রহী এবং সত্যই সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে মাত্র চার দিনের মধ্যে ছয় হাজারেরও বেশী মানুষ নাম নথীভূক্ত করেন যা দেখে আমরা অভিভূত। এই সমস্তই সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার কারণে।''

পরিশেষে বিশেষ মুহূর্তটি ছিল যখন ইসকন জিবিসি সচিব গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ আঠারোতম অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে তাঁর হৃদয় স্পর্শী শব্দ সমূহের দ্বারা আশীর্বাদ করেন এবং প্রত্যেককে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে বলেন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে পারমার্থিক সেবার পদ্ধতি গ্রহণ করতে বলেন।

দর্শককুল এক অভিভূতকারী মতামত জ্ঞাপন করেছেন। দর্শকদের মধ্যে ভারতীয় পুলিশ সেবা আধিকারিক, সরকারী আধিকারিক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, ফার্ম নির্দেশক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছিলেন। পরিশেষে তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এই সমস্ত মানুষজনকে যাতে আরও কৃষ্ণভাবনাময় করা যায় তার জন্য আরও কৃষ্ণভাবনাময় শিক্ষা ক্রমের পরিকল্পনা চলছে।

পরিশেষে এটি প্রমাণ করে যে এই মানুষগুলির জন্য করোনা, নিঃসন্দেহে কৃষ্ণকরুণা বহন করে এনেছে।

ব্রহ্মসংহিতা

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৬।।

যদ্—যাঁর; **ভাব**—ভাবে; **ভাবিত -ধিয়ঃ**—বিভাবিত বুদ্ধি বা ভাবভক্তিপ্রাপ্ত; **মনুজাঃ**—মানুষেরা; **তথা এব**—নিজ নিজ সিদ্ধ ভাব অনুরূপ; **সংপ্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **রূপ** —সৌন্দর্য; **মহিমা**—মহিমা; **আসন**—আসন; **যান**---যানবাহন; **ভূষাঃ**---এবং ভূষণাদি; **সূক্তৈঃ**---বৈদিক মন্ত্র দ্বারা; **যং**---যাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নিগম-প্রথিতৈঃ**— বেদ দ্বারা উক্ত; **স্তুবন্তি**—স্তব করেন; **গোবিন্দম্** --- গোবিন্দকে; **আদি - পুরুষং** --- আদিপুরুষকে; **তম্**—সেই; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

যাঁর ভাবরূপ ভক্তিতে বিভাবিত চিত্ত মানুষেরা রূপ, মহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করে বৈদিক মন্ত্র সূক্ত দ্বারা তাঁকে স্তব করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।

যদ্ ভাব ভাবিত ধিয়ঃ—শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিশেষ ভাবিত বুদ্ধি। অর্থাৎ, ভাবভক্তি প্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর ভাবের উদয় হয়েছে, শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর লক্ষণগুলি বর্ণনা করেছেন। সেই ভাবলক্ষণগুলি হচ্ছে—

১) সময়ের সদ্ ব্যবহার—কখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে না বসে তিনি সব সময় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অবিচলিতভাবে ভগবদ্ সেবা করতে আগ্রহী থাকেন। একটি মুহূর্তও ভক্ত অন্য কোন কার্যকলাপে নষ্ট করেন না।

২) সহিষ্ণুতা---নানা গোলমালের মধ্যেও ভক্ত অবিচলিত থাকেন। ধীর ও প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তি কারও আঘাতে বা অভিশাপেও বিচলিত হন না।

৩) বিষয়ে অনাসক্তি—নানা প্রলোভনের মধ্যেও যিনি জড় বিষয়ে আসক্ত বা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন না।

৪) অমানী—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যিনি ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা তুচ্ছ পদও গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করেন না। ভক্ত সব লাঞ্ছনা হাসি মুখে সহ্য করেন। তাঁর কাজের বিনিময়ে কোন রকম জাগতিক সম্মান আশা করেন না।

৫) আশাবন্ধ—যেহেতু আমি ভগবদ্ভক্তির নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, তাই আমি অবশ্যই ভগবানের কাছে ফিরে যাব। এভাবে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রত্যাশী হওয়াকে আশাবন্ধ বলা হয়। কখনও বা ব্যথাতুর হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়ে ভাবে 'আমি কেন উল্টোপাল্টা হয়ে গেছি, জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে আমি এগোচ্ছি না। না আমাকে

অবশ্যই কৃষ্ণের চরণপদ্মের দিকে যেতেই হবে।'

৬) সমুৎকণ্ঠা—কিছু পেতে হলে মূল্য দিতে হয়। কৃষ্ণভক্তি পাবার মূল্য হলো গভীর উৎকণ্ঠা। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন আশায় ব্যাকুল হয়ে থাকেন।

৭) ভগবানের দিব্য নামের প্রতি আসক্তি—ভক্ত ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না। তাই তিনি সর্বদা কৃষ্ণনাম জপ, স্মরণ, কীর্তন, ধ্যান করে থাকেন।

৮) শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ লীলা পরিকর বর্ণনায় আগ্রহ---জড়বুদ্ধি লোক হাবিজাবি কথায় আগ্রহী। ভক্ত কৃষ্ণকথায় আগ্রহী।

৯) শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীতে বাস করার আকাঙ্ক্ষা —ভগবানের লীলাস্থলী দর্শন করা, পরিক্রমা করা, প্রণতি নিবেদন করা, বাস করা, ধামমহিমা আলোচনা করা ভক্তদের বৈশিষ্ট্য। এমন কি ভগবৎ লীলাস্থলী থেকে যাঁরা দূরে থাকেন তাঁরাও ভগবৎ লীলাস্থলীর কথা স্মরণ করেন বা ছবি দেখেন।

ভক্তি-ভাব রস বিচারে পাঁচ রকমের। যথা—

১) শান্ত—কেউ যখন নিরন্তর শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন, তখন তাঁর সেই অবস্থাকে ভগবদ্ভক্তির শান্ত রস বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'আমার স্বরূপে যখন কারও চিত্ত স্থির হয়, তখন তাকে বলা হয় শান্ত রস। সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত না হয়ে কেউ যথার্থ শুদ্ধভক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

২) দাস্য—স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎপ্রেমে সেব্য ও সেবকের মধ্যে অন্তরঙ্গ আসক্তি বা মমতা যুক্ত হয়।

৩) সখ্য—দাস্য প্রেমে মমতা থাকলেও ভয় ও সম্ভ্রম সহজে উদিত হয়। সেই ভয়-সম্ভ্রম পরিত্যাগ করে একান্ত বিশ্বাস বা বিশ্রম্ভ বরণ করলে সখ্য প্রেম হয়। সখ্য রসে কৃষ্ণ ও সখাদের মধ্যে সমতা ভাব উদিত হয়।

৪) বাৎসল্য—সখ্য রসে সমতা ভাব আছে। কিন্তু এই সমতা যখন অধিকতর উন্নত হয়ে স্নেহে পর্যবসিত হয়, তখন বাৎসল্য প্রেমে পরিণত হয়।

৫)মধুর–সাধারণ প্রেমে মমতা নেই। দাস্য প্রেমে মমতা থাকলেও বিশ্রম্ভ বা বিশ্বাস নেই। সখ্য-প্রেমে বিশ্রম্ভ থাকলেও নিঃসঙ্কোচ ভাব নেই। কিন্তু এই সব ভাবই রয়েছে মধুর রসে।

মনুজাঃ তথা এব প্রাপ্য —মানুষ নিজ নিজ সিদ্ধ ভাব অনুরূপ উচিত প্রাপ্য স্থান লাভ করেন।

রূপ মহিমা আসন যান ভূষাঃ—রূপ, মহিমা, আসন, যান ও ভূষণ। সেই সেই ভাবের ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত সেবা করে চরমে উচিত প্রাপ্য স্থান লাভ করেন। নিজ নিজ রসের অনুরূপ চিৎস্বরূপ লাভ করেন। উচিত মহিমা, উচিত সেবা -পীঠরূপ আসন, উচিত যাতায়াতের যান এবং নিজ রূপ সমৃদ্ধিকারী চিন্ময় গুণ -ভূষণও লাভ করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন —যাঁরা শান্ত রসের অধিকারী তাঁরা শান্তিপীঠ ব্রহ্ম-পরমাত্ম ধাম, যাঁরা দাস্য রসের অধিকারী তাঁরা ঐশ্বর্যগত বৈকুণ্ঠ ধাম, যাঁরা শুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারী তাঁরা সর্বোচ্চ ধাম গোলোক লাভ করেন।

সূক্তৈঃ যং এব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি—ভক্তরা (সূক্তৈঃ এব) মন্ত্র সূত্রের দ্বারা, (যং) যাঁকে, (নিগম প্রথিতৈঃ) শ্রুতি প্রসিদ্ধ, (স্তুবন্তি) স্তব করেন। ভক্তরা সেই সেই স্থানে নিজ নিজ রসোচিত সমস্ত উপকরণ ও সামগ্রী প্রাপ্ত হয়ে বৈদিক সূক্ত অনুসারে ভগবানের স্তব করেন।

গোবিন্দ আদিপুরুষম্ তম্ অহং ভজামি—বিভিন্ন ভাবের ভক্তদের দ্বারা বৈদিক মন্ত্র দ্বারা স্তুয়মান আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

– সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

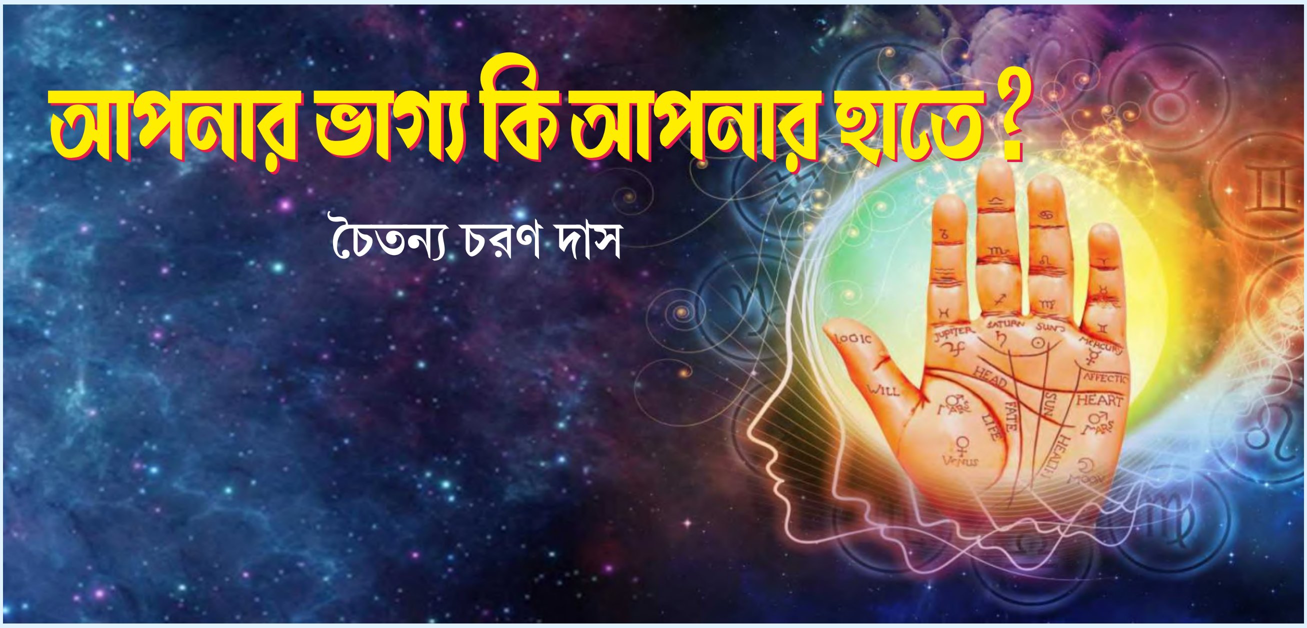

আপনার ভাগ্য কি আপনার হাতে?

চৈতন্য চরণ দাস

“আমরা কি আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা অথবা জীবন কি পূর্ব-নির্দিষ্ট?”

মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, “আমাদের ধর্ম নয়, ভাগ্য আমাদের কর্মফল নির্ধারণ করে।” এর অর্থ এই যে, আমরা পূর্ব পরিকল্পিত রোবটের মতো যার কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা পছন্দ নেই। আমাদের অতীত কর্ম নির্ধারণ করে আমাদের জীবনে কি ঘটবে, কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া সেই ঘটনার প্রতি কি হবে তা পূর্ব নির্ধারিত নয়।

ভাগ্য হলো একটি যাত্রার পূর্বে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমাদের বলে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাত্রাকালে রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে, না তুষারাচ্ছন্ন থাকবে। কিন্তু তা কখনোই যাত্রাকালীন আমাদের কার্যাবলীকে নির্ধারণ করে না।

ভাগ্য বিষয়ে দুইটি মতবাদ আছে কর্মবাদ এবং দৈববাদ। কর্মবাদ অর্থাৎ এই চিন্তা করা, “আমার কর্মের দ্বারাই আমি সফল হবো। যদি আমি কঠিন পরিশ্রম করি এবং যথেষ্ট সক্ষম হই তাহলে আমি পরবর্তী বিল গেটস্ হবো। আমি আমার অধ্যবসায় এবং শক্তির দ্বারা সফল হবো”। কিন্তু জীবনের বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখতে পাবেন কত লোক কঠিন পরিশ্রম করছে কিন্তু সবাই সফল হয় না। সেইজন্যে কর্মবাদ, সেই মতবাদ যে সমস্তই আমার কর্মের উপর নির্ভর করছে তা হতাশা নিয়ে আসে এবং এই মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের ভিতর হীনমন্যতা আসে। বাস্তবে শুধুমাত্র আমাদের কর্মই একা কর্মফল নির্ধারণ করে না।

অনেক সময়, বহু পড়াশুনা করেও ভালো নম্বর না পেলে আমরা দুঃখ বোধ করি। কিন্তু যদি আমরা সৎ হই, আমরা স্বীকার করবো যে, জীবনে অনেক সময়ই শুধু পরীক্ষার আগে কয়েক ঘন্টা পড়াশুনা করেও আমরা ভালো নম্বর পাই। সুতরাং কর্মের নীতি দুইভাবে কাজ করে। কখনও আমাদের অতীতের ভালো কর্মের দরুণ আমরা সঠিকভাবে কর্ম না করেও ভালো প্রতিক্রিয়া পাই।

অপরপক্ষে দৈববাদের অর্থ ভাবা “সমস্ত কিছুই ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আমি কি করতে পারি?” পাণ্ডবদের উপর দুর্যোধনের পাশবিক আচরণের সময় নিজের নিষ্ক্রিয়তার স্বপক্ষে ধৃতরাষ্ট্রও এই দৈববাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিদুর তাকে বলেছিলেন, “পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে আপনার পুত্রকে নিরস্ত করুন। শ্রীকৃষ্ণের শান্তি প্রস্তাব তাকে স্বীকার করতে বলুন।” ধৃতরাষ্ট্র প্রত্যুত্তরে বলেন, “না, যদি এটিই নিয়তির ইচ্ছা, তাহলে মহাশক্তিশালী নিয়তির ইচ্ছায় আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ কিভাবে বাধা দিতে পারে?” বিদুর তাকে মনে করিয়ে দিলেন, “আপনারও কর্তব্য আছে; আপনার কর্তব্যকর্ম করা বা না করার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা আপনার রয়েছে। সুতরাং আপনার পুত্রকে নিরস্ত করার জন্য আপনার সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা উচিত।”

বহু পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং পাশ্চাত্য ধারণার বশবর্তী ভারতীয়গণ বৈদিক দর্শনকে ভুল বোঝেন। তারা ভাবেন যে, বৈদিক দর্শন অদৃষ্টবাদী কারণ সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত এবং এইরূপে এই মতবাদ কোন উদ্দেশ্যবাহিত

কর্মকে নিরস্ত করে। কিন্তু বস্তুত, ভারতীয়রা অলস নন। পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য মহাভারতে ১,১০,০০০ শ্লোক বর্তমান। এটি পৃথিবীর পরবর্তী দুই বৃহৎ মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসির যুগ্ম আকারের থেকেও সাত গুণ বেশী। অলস মানুষ কি এরূপ বৃহৎ সৃষ্টি রচনা করতে সক্ষম? সাহিত্য স্থাপত্য, শিল্পকলা এমন কি বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রও বৈদিক যুগে মহা উচ্চতায় পৌঁছেছিল। এই সকল কোন অলস মানুষের কর্ম হতে পারে না। অতএব বৈদিক দর্শন দৈববাদী নয়।

প্রকৃত বৈদিক উপলব্ধি হলো এই যে, আমাদের এই জীবনের কর্ম এবং পূর্বজীবনের কর্মের প্রতিক্রিয়া যৌথভাবে আমাদের কর্মফল নির্ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, বীজ বপন এবং জমি কর্ষণ করা কৃষকের কর্ম। কিন্তু বৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে হবে কি না তা দৈব।

যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি না হলে শুধু বীজ বপন এবং জমি কর্ষণে ফসল ফলে না। অনুরূপভাবে বীজ বপন এবং জমি কর্ষণ বিনা শুধুমাত্র যথেষ্ট বৃষ্টিপাতেও কোন ফসল ফলে না। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রে কথিত আছে যে, তুমি অবশ্যই শুধু তোমার কর্ম করো, সঠিক কর্ম এবং দৈব অংশ সম্বন্ধে চিন্তা করো না। দৈব সম্বন্ধে চিন্তা না করার অর্থ হলো আমাদের কর্ম যাই হোক না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্য যেন আমাদের হতোদ্যম না করে। এটি এইরকম কারণ যদি আমরা এখন আমাদের কর্ম করি, দৈব অনুকূল হলে তার ফল আমরা লাভ করব। কিন্তু বর্তমানে দৈব প্রতিকূল হলেও এই সঠিক কর্ম ভবিষ্যতের জন্য দৈবের আনুকূল্য সৃষ্টি করে। সেইজন্য একজনের সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনকালে হতোদ্যম বা হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

এটি মনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কোন ব্যক্তি সুকর্ম করে, সেই সুকর্ম সুকর্মফল নিয়ে আসে এবং তার অর্থ সেই সুকর্মফল ভোগ করার জন্য তাকে জড়জগতে আরও অবস্থান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি নিখরচার জলের কল দান করে সেটি অবশ্যই সুকর্ম কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে যখন সে জলাভাব বোধ করবে না। হয়ত কোন নদী অথবা দীঘির কাছে তার জন্ম হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক দান করে, তাহলে পরবর্তী জন্মে সে হয়ত কোন মুদ্রণালয়ের মালিক হবে। কিন্তু জড়জগতে জন্মগ্রহণ করার অর্থ তার জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে এবং জড় অস্তিত্বের ত্রিতাপ ক্লেশও ভোগ করতে হবে।

এইরূপে পুণ্যকর্মের দ্বারাও আমরা এই জড়জগত থেকে নির্গত হতে পারি না, কারণ পুণ্যকর্মের আধ্যাত্মিক কর্ম বা অকর্ম হওয়া আবশ্যিক নয়। যতক্ষণ আমরা ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে থাকবো, আমরা জড়জগতে থাকবো। এই দুঃখালয় জড়জগত থেকে নির্গত হওয়ার প্রকৃত পথ হলো ভক্তির জাগরণ যেটি বাস্তবিক অকর্ম।

জ্ঞানের শক্তি

সামাজিক ঃ বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে কর্মকে উপলব্ধি করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃত কর্মকে যখন শুধুমাত্র অনুধাবন করা যায় তখন আলাদাভাবে নৈতিকতার কোন অর্থ থাকে না। কল্পনা করুন আপনী একটি শহরে এসেছেন সেখানে লেখা আছে, ‘‘আমাদের শহরে স্বাগতম্। এই শহরে কোন পুলিশ নেই; দয়া করে আইন মেনে চলুন।’’ কি ভাবছেন, কেউ আইন মানবে? কেউ না। বর্তমান সমাজ এইরকমই। আইনি ব্যবস্থা দুর্বল ও ভ্রষ্ট বলে বিদিত। লোকে ভাবে, ‘‘যদি আমি পর্যাপ্ত চালাক হই, যদি আমি যথেষ্ট প্রভাবশালী হই অথবা যথেষ্ট চতুর হই তাহলে আমি যা চাই তা করতে পারি এবং আমি এভাবেই চলতে পারি।’’ সুতরাং যদি আমরা সমাজে নৈতিকতা চাই তাহলে আমাদের মানুষকে সেই শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে করে তারা কর্মের নিয়মকে অনুধাবন করতে পারে। শুধুমাত্র তখনই নৈতিকতা,

ভাগ্য হলো একটি যাত্রার পূর্বে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমাদের বলে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাত্রাকালে রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে, না তুষারাচ্ছন্ন থাকবে। কিন্তু তা কখনোই যাত্রাকালীন আমাদের কার্যাবলীকে নির্ধারণ করে না।

মানবিকতা ইত্যাদি শব্দগুলির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হবে। তাই এটি কথিত আছে যে, ভগবানের প্রতি ভীতিই হচ্ছে জ্ঞানের প্রারম্ভ, ঠিক যেমন পিতার প্রতি ভীতিই হচ্ছে তার সন্তানের অধ্যয়নের প্রতি তৎপরতা। আমাদের মধ্যে কতজন পিতা-মাতা আমাদের অধ্যয়নের জন্য আমাদেরকে তাড়িত করেছেন? প্রায় সকলেই, কখনো কখনো সর্বদা, আবার কখনো মাঝে মধ্যে। সেই মুহূর্তে আমরা এটিকে মোটেই আনন্দদায়ক মনে করি না, কিন্তু পরবর্তীকালে এরজন্য আমরা পিতা-মাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। যদি আমরা সেই সময় অধ্যয়ন না করতাম, তাহলে হয়তো আমরা সমস্যায় পড়তাম। সুতরাং এখানে এটি প্রতিপন্ন হয় যে, ভীতিই হচ্ছে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উৎসাহকারী বিষয়। অনুরূপভাবে যদি কর্মের নিয়ম সম্পর্কে বা কর্মের ফলভোগের ভীতির সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণা না থাকে, তাহলে অধিকাংশ মানুষই সুকর্ম করার প্রতি উৎসাহী হবে না।

ব্যক্তিগত ঃ সম্ভবত কর্মের বিধি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা আমাদের বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করতে সহায়তা করে এবং দুর্দশার সঙ্গে লড়াই করতে শক্তির যোগান দেয়। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হীন সেই ব্যক্তি যিনি অজ্ঞানজনিত অন্ধ এবং উচ্চ, নীচ, বাম, দক্ষিণ, সম্মুখ, পশ্চাত সমস্ত দিক থেকে আক্রান্ত এবং সে এও জানে না যে পরবর্তী আঘাত কোথা থেকে আসবে বা কেন আসবে। যেকোন মুহূর্তে যে কেউ এমন দুরবস্থার মধ্যে পতিত হতে পারে যার কারণে সে অসহায়ভাবে বহু প্রশ্নের উত্তর যথা, ‘‘কেন আমি, কেন এখনঅথবা কেন এরকম?’’ ইত্যাদি হাতড়াতে থাকে।

যখন আমরা কর্মের বিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণ রূপে অবহিত হই তখন অজ্ঞানতার অন্ধকার দুরীভূত হয়। এটি হচ্ছে মহা উপশম।

যখন আমি অসুস্থতার কারণে কয়েক মাস যাবৎ হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, তখন আমি অন্যান্য রোগীদেরকে দেখতাম এবং তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতাম। একটি বিষয় তারা অনুধাবন করতে পারতেন না এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন যেটি হলো, ‘‘আমার সমস্ত আত্মীয় বন্ধুরা সুখী, তারা তাদের গৃহে আছে, তারা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত এবং জীবনকে উপভোগ করছে (প্রকৃতপক্ষে এভাবে কেউই জীবন উপভোগ করছে না, কিন্তু এটিই হচ্ছে ভ্রম)। কেন আমি এখানে একা দুঃখ ভোগ করছি?’’ মানুষ যখন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন তাকে এই চিন্তাই ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। কিন্তু আমার মতো ভক্তের কাছে এটি এক অনুভব যে আমার দুর্ভোগ আমারই কৃত কর্মের ফল, ‘‘আমাকে শুধুমাত্র সহনশীল হতে হবে এবং তার নিবারণ হবেই।’’

এভাবেই কর্মের বিধির জ্ঞান আমাদেরকে দুর্ভোগ থেকে নিস্তার পেতে এবং সহনশীলতার সঙ্গে মুখোমুখি হতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের ভবিষ্যত প্রস্তুতির জন্য প্রত্যয় প্রদান করে। এটা শুধুমাত্র এই নয় যে, কর্ম বিধি সম্বন্ধে অবগত হয়ে আমরা দুর্ভোগ মুক্ত হবো। আমরা ঠিক রোগাক্রান্ত এক ব্যক্তির মতো রোগের কারণ এবং এর থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধেও অবহিত হতে পারবো। যন্ত্রণা এখনো বর্তমান কিন্তু তা লঘুতা প্রাপ্ত হতে শুরু করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি এর উপশম সম্বন্ধে অবহিত নয় তার যন্ত্রণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চরমে সে অসহায় বোধ করে এবং পরিশেষে বিদ্ধস্ত হয়। কিন্তু একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সত্বরই হোক বা পরে হোক দুর্দশার অবসান হয়।

তাই কর্মের বিজ্ঞান পরিবাদের বিজ্ঞান নয়, বরং এটি মুক্তির বিজ্ঞান। এর অর্থ এই নয়, ‘‘আপনি পাপী তাই ভোগ

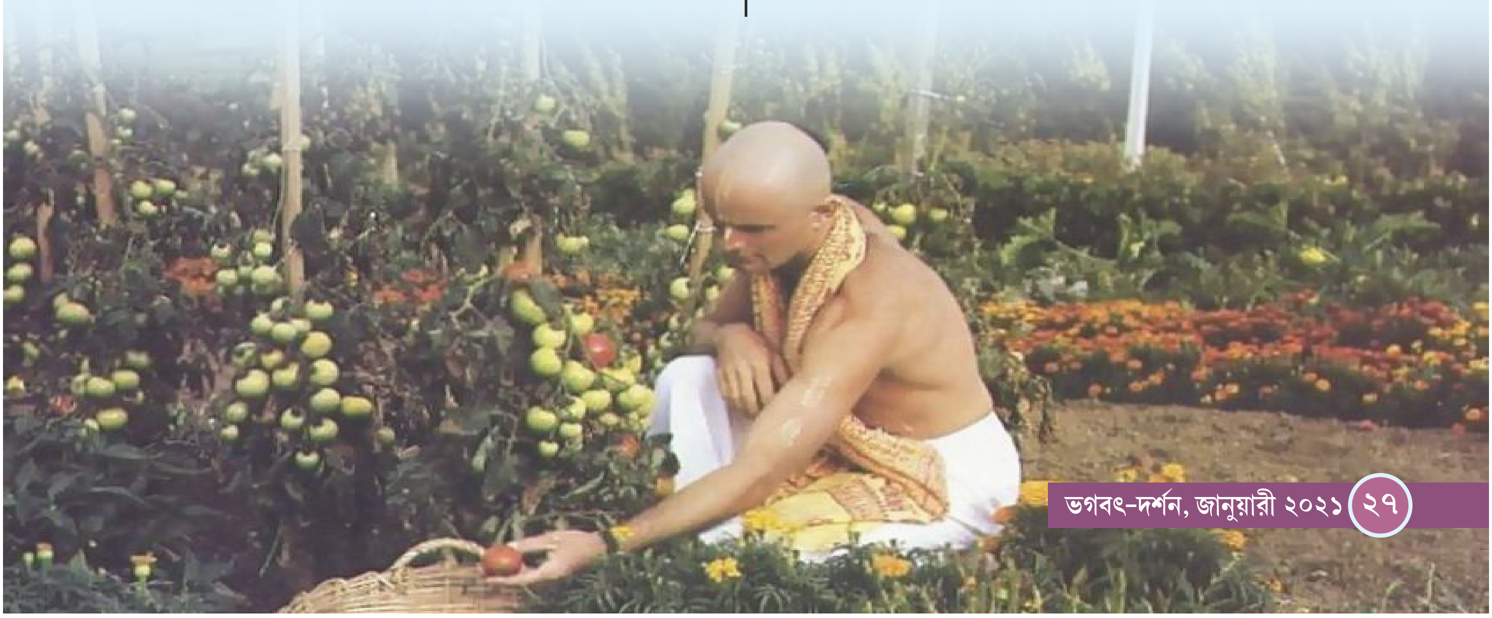

করছেন”। “অর্থটি হলো যে আপনার অতীত কর্মের জন্য আপনি এখন যা ভোগ করছেন, শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হলেই এবং তাঁর পরম কৃপার প্রভাবে আপনি সুরক্ষিত থাকবেন।”

ভক্তি দ্বারা মুক্তি ঃ

সুকর্মের অতীত আরও একটি কর্ম আছে যাকে অকর্ম বলা হয়, যা হলো পারমার্থিক সেবা যা কর্মবন্ধ থেকে পূর্ণরূপে মুক্তি প্রদান করতে পারে। এখন দেখা যাক সেটি কিরূপে। পারমার্থিক সেবা আমাদেরকে চারটি মহত্ত্বপূর্ণ উপহার প্রদান করে।

১) ঠিক এবং ভুলের পার্থক্য নিরূপণ ঃ

যখন আমরা পারমার্থিক সেবাতে নিয়োজিত হই তখন আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত পরমাত্মারূপী ভগবান আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞানের অনুমোদন করেন। আমরা প্রত্যেকেই কখনো কখনো অথবা সর্বদাই চেতনার শব্দ শুনতে পাই (সংস্কৃতে যা বিবেক-বুদ্ধি)। যখন আমরা কোন কিছু ভুল করতে উদ্যত হই তখন আমাদের অন্তরাত্মা আমাদের সাবধান করে, “এটি করো না”। যখন আমরা কোন সঠিক কাজ করতে চাই, তখন অন্তরাত্মা বলে, “হ্যাঁ এখন করতে পারো।” সুতরাং আমরা যখন ভগবানের দিব্য নাম জপ করি, যখন আমরা পারমার্থিক সেবাতে নিযুক্ত থাকি, তখন এই অন্তরাত্মার আওয়াজ শক্তিশালী হয় এবং তা আমাদের জীবনের সঠিক সিদ্ধান্তগুলি নিতে পূর্ণ সহায়তা করে। তাই পারমার্থিক সেবা ক্রমেই আমাদের সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে কি রূপে মুক্তি লাভ করা যায় সেই জ্ঞান প্রদান করে।

২) অভ্রান্তকে অনুসরণ এবং ভ্রান্তকে পরিত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প ঃ

পারমার্থিক সেবা আমাদের পরবর্তী কুকর্ম করা থেকে রক্ষা করে এবং কুকর্ম করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেও নিরস্ত করে।

ভগবানের দিব্য নাম জপ আমাদের হৃদয়কে এমন প্রসন্নতা প্রদান করে যার প্রভাবে আমরা এই জড় জগতের পাপপূর্ণ উপভোগগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হই। তাই আমরা শুধুমাত্র সঠিক নির্বাচনটি যে জানতে পারি তা নয়, আমরা সেই সমস্ত সঠিক নির্বাচনগুলি রূপায়িত করতে ইচ্ছাশক্তিও প্রাপ্ত হই।

৩) পাপের প্রতিক্রিয়ার লঘুকরণ ঃ

কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া আমাদের পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারে আসে। কিন্তু পারমার্থিক সেবা সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে লঘু করতে আমাদের সহায়তা করে। ভক্তদের জন্য ভগবান পূর্ণ প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রতীকি প্রতিক্রিয়া দিয়ে থাকেন। এই প্রতীকি প্রতিক্রিয়া প্রদানের কারণটা হলো ভক্ত যাতে এই দুর্দশা পূর্ণ জড়জগতের চরিত্রটি বিস্মৃত না হয়।

৪) দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আত্মিক শক্তি ঃ

অপ্রারব্ধ কর্মফল যা আমাদের আসে, পারমার্থিক সেবা আমাদের সেই দুর্দশা ভোগের শক্তি ও সহনশীলতা প্রদান করে। কৃষ্ণের অপর এক নাম করুণানিধি, করুণার সাগর। আমাদের আচার্যবর্গ একটি উদাহরণ দেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে দুর্দশা ভোগের প্রতি আমাদের সহনশীলতার শক্তি প্রদান করেন। যখন একটি বালক স্কুলে যায় তার মা জানেন, আজ আমার সন্তান ঠিকমতো গৃহশিক্ষার পাঠ অনুশীলন করেনি এবং সেই কারণে শিক্ষক তার হাতে বেত্রাঘাত করতে পারেন। মা কখনোই চান না তাঁর সন্তান আঘাত প্রাপ্ত হোক, আবার এটাও চান যে তাঁর সন্তান নিয়মনিষ্ঠ হোক। তাই তিনি তাকে স্কুলেও পাঠান, আবার হাতমোজাও পরিয়ে দেন। উদ্দেশ্য হলো, যখন শিক্ষক বেত্রাঘাত করবেন তখন সে তার প্রভাব অনুভব করতে পারবে কিন্তু যন্ত্রণা অনুভব হবে না। অনুরূপ ভাবে কোন ভক্ত যখন জড়জগতে তার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ ভোগ করে (যিনি শিক্ষকের মতো), কৃষ্ণ (যিনি মায়ের মতো) তখন তাঁর ভক্তদের তাঁর দিব্য নাম প্রদান করেন যা জপের ফলে সেই ভক্ত সহনশীলতা প্রাপ্ত হয় এবং দুঃখকে অতিক্রম করার শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাই বাহ্যিক রূপে কোন ভক্তকে দেখে মনে হতে পারে তিনি দুঃখে আছেন, কিন্তু অন্তরে যেহেতু তিনি দিব্য নামের স্মরণে আছেন তাই কোন দুঃখই তার অনুভব হয় না। যাঁরা আরও উন্নত স্তরের ভক্ত তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত এই সুরক্ষাটিকে আরও অধিক রূপে অনুভব করতে পারেন।

পরিশেষে, সমস্ত অপ্রারব্ধ কর্ম ব্যতিরেকেই, পারমার্থিক সেবা বিজ্ঞানটির অভ্যাস যোগ এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনে পরম সুখের সর্বোত্তম পন্থা।

জীবন্ত নরক!!

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প থেকে সংগৃহীত
এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ একদা মাতালকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্যঃ

এই জড়জগতে বহুলোক মনে করে যে, যদিও বহু মানুষ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয় তাতেও বিচলিত হবার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে পতিত জীব কখনই ভগবানের আন্তরিক সেবার প্রতি আগ্রহী নয় এবং এই জগতে এরকম মানুষের সংখ্যাই বেশী। এভাবেই এই নরপশুর দল ভগবানের সেবা না করে আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগে এবং মনে করে যে তাদের ভাগ্যও অন্যান্য নাস্তিকদের মতোই "সুতরাং কি প্রয়োজন কিছু সাধু মহাত্মার কাছে গিয়ে ধর্মকথা শোনার! এর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে যাওয়াই ভালো।" তাই বহু মানুষ এভাবেই ভগবানের সেবা বিমুখ হয়ে পড়ে। এটিই হচ্ছে রজোগুণের পরিচায়ক।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

শ্রীল রূপ গোস্বামী

হন্ত ক্লীবোহপি জীবোহয়ং
নীতঃ কষ্টেন ধৃষ্টতাম্।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নাথৌ
প্রসাদঃ কোহপ্যুদঞ্চতু ।।১।।

সাধন ভজন বিহীন এ জন
ভব সংসারে পড়ি।
অসহ বেদনা শত বিড়ম্বনা
তাই প্রার্থনা করি।।
হে প্রাণেশ্বর বৃন্দাবনেশ্বর
হে বৃন্দাবনেশ্বরী!
করুণা করিয়া বারেক চাহিয়া
হও প্রীত মোর পরি।।

বাচেহ দীনয়া যাচে
সাক্রন্দ মতিমন্দধীঃ।
কিরতং করুণস্বান্তৌ
করুণোর্মিচ্ছটামপি।।২।।

করুণা হৃদয় কৃষ্ণ দয়াময়
হে দয়াময়ী রাধে!
সারা দিনক্ষণ এই মন্দ জন
ব্রজভূমে বসি কাঁদে।।
অতি দীন বাকে বারে বারে ডাকে
হে কৃষ্ণ, কৃপা করো।
ওগো কৃপাময়ী কৃষ্ণপ্রেমময়ী
কৃপাদৃষ্টি দান করো।।

মধুরাঃ সন্তি যাবন্তো
ভাবাঃ সর্বত্র চেতসঃ।
তেভ্যোহপি প্রেমমধুরং
প্রসাদী কুরুতং নিজম্।।৩।।

রাধা মহাভাব কৃষ্ণ রসরাজ
হে পরম রসময়।
নিত্য ধামে যত মধু রস ব্রত
প্রেমভাব সর্বশ্রেয়।।
যুগল পীরিতি সুমধুর অতি
হৃদ্মাঝে দুঁহে ধরি।
কৃপা করি মোরে দেহ প্রেম কণা
এই প্রার্থনা করি।।

সেবামেবাদ্যে বাং দেবা-
বীহে কিঞ্চন নাপরম্।
প্রসাদাভিমুখৌ হন্ত
ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি।।৪।।

পরম আরাধ্য হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ
পরমারাধ্যা রাধিকা।
দুঁহার শ্রীনাম গাহি সর্বক্ষণ
ভকতি যোগ সাধিকা।।
নাহি চাহিবার অন্য কিছু আর
কেবলি এই মিনতি।
রাখহ আমায় যুগল সেবায়
প্রীত হও মোর প্রতি।।

নাথিতং পরমেবেদং
অনাথজনবৎসলৌ।
স্বং সাক্ষাদ্দাস্যমেবাস্মিন্
প্রসাদী কুরুতং জনে।।৫।।

কেহ নাহি যার তুমি আছো তার
হে অনাথের নাথ।
অনাথ পালিকা ওগো শ্রীরাধিকা
প্রণময় এ অনাথ।।
রাখহ আমায় যুগল সেবায়
কৃপা করি নিরবধি।
রাধিকা আমার কৃষ্ণ আমার
চির জীবনের নিধি।।

সৌভাগ্যাঙ্ক-রথাঙ্গাদি-
লক্ষিতানি পদানি বাং।
কদা বৃন্দাবনে পশ্যন্
উন্মদিষ্যত্যয়ং জনঃ।।৬।।

সৌভাগ্য সূচক চক্রাদি চিহ্নিত
চরণপদ্ম হেরিব।
বনে বনে ব্রজে শ্রীচরণ রজে
পরশে ধন্য মানিব।।
শ্রীরাধিকাযুত হে প্রাণনাথ
হে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা!
সে ভাগ্য আমার কবে হেরিবার
যুগলের রূপশোভা।।

সর্বসৌন্দর্য-মর্যাদা-
নীরাজ্যপদনীরজৌ।
কিমপূর্বাণি পর্বাণি
হা মমাক্ষ্ণো বিধাস্যথ।।৭।।

পরম সুন্দর সৌন্দর্য আকর
রাধাকৃষ্ণ দুই জনা।
আর এ জগত সুন্দর যত
দুঁহে করে আরাধনা।।
হে প্রিয় সুন্দর সর্ব মনোহর
সর্ব মনোহরা রাধে।
দেহ দরশন এ দুটি নয়ন
ঝরুক নির্বিবাদে।।

সুচিরাশাফলাভোগ-
পদাম্ভোজ বিলকনৌ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য
ভবেতমিহ কিং ভবে।।৮।।

কমল চরণ যে করে দর্শন
আশা পূর্ণ হয় তার।
চাহিবার আর নাহি কিছু তার
সার্থক প্রাণ তার।।
হে নাথ শ্রীহরি হে শ্যামপিয়ারী
এই জনমে কি আর।
তব শ্রীচরণ হবে দরশন
সেই ভাগ্য আমার।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী